

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সিংহ
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩, কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা ৩

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন প্রেস

দাম : সাড়ে পাঁচ টাকা

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

উপন্যাস

কাঁচকাঞ্চন
জনম অবধি
শেষ নাগ
মণি বেগম
কুমারী মন
মেঘে ঢাকা তারা
জীবন কাহিনী
রাতের পাখিরা
কেউ ফেরে নাই
গৌড়জন বধূ
বর্ণান্তর
অন্তরে অন্তরে
কাজল গাঁয়ের কাহিনী
গঙ্গাহৃদি

ছোট গল্প

অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর
পালা বদল
মনময়ূর

নাটক

শেষাগ্নি
মেঘে ঢাকা তারা

সূত্রধর

এক হাট থেকে অন্য হাটে পসরা নিয়ে যায় ব্যাপারী।

তেমনি দোকানদার'বাজীর দল ঝুমরীর দলও ঘোরে এক মেলা থেকে অন্য মেলায়। সেখান থেকে আবার অন্যত্র।

এই ঘূর্ণিপাকে পড়ে যারা ঘোরে অনেকেই তাদের অনেককে চেনে। পুরন্দরও জীবনের বহু বৎসর এই ঘূর্ণিপাকে পড়ে ঘুরছে, আজও সে পথ ফুরোয় নি।

একটা বাঁশী বাজছে নির্জন প্রান্তরে। পথে চলতে চলতে কানিকুড়ো মন দিয়ে বাঁশীটা বাজাচ্ছে। এক মেলা থেকে অন্য মেলা যাবার ভিড় চুকে গেছে—যারা এগিয়ে গেছে তারা সেখানে গিয়ে ইতিমধ্যেই জাঁকিয়ে বসেছে। পিছনে পড়ে গেছে এরা ঝড়তি পড়তির দলে।

পথে চলেছে একদল ঝুমরি।

ওদের হাসির শব্দে পুরন্দর গাড়ি থেকে একবার মুখ তুলে চাইল।

হাসছে মেয়েরা। ওদের কেউ কেউ সখ করে গরুর গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই চলেছে। পাশপাশাড়ি ক্ষেত থেকে তুলেছে দু'একটা কাঁচা ছোলার গাছ; তাই চিবুচ্ছে আর হঠাৎ মানুষ দেখে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। শূন্য প্রান্তর ওদের হাসির সুরে ভরে ওঠে।

কানিকুড়োর বাঁশী থেমে গেছে।

গরুর গাড়িতে চাপবার যোগ্যতা তার নেই। পায়ে হেঁটেই চলেছে সে।

পুরন্দরকে মুখ তুলতে দেখে বলে ওঠে ছেলেটা:

—ঝুমরির দল গো মাশায়।

বেন্দা বায়েন আর বিষ্টুপদ সানাইদার পুরন্দরের দলের আসামী, তারাও পথচলতি ওই রংবাহার-এর দিকে চেয়ে থাকে। এদলে ওসব রং নেই। ওদের তাই দেখছে।

মেয়েগুলো গাড়ি সমেত এগিয়ে যায়। তেজী গরু ওদের; পুরন্দরের ভাড়াকরা আধমরা গরুর গাড়ি নয়। বেশ তেজী গরু।

ঝুমরি দলের গাড়ির গাড়োয়ানগুলো ফূর্তি করে চালাচ্ছে।

ঝুমরির দল ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে গেল। মেয়েদের গলার স্বুর ভেসে আসে। বাতাসে হাসির শব্দ ভাসছে তখনও।

এগিয়ে যাবে ওরা, পুরন্দরই বলে ওঠে ঃ

—সিনান ভাত করে লে তোরা ইবেলা, আমারও শরীরটা ভাল নাই, একটু বেলা গড়িয়ে ঠাণ্ডা রোদে যাবো।

গাড়োয়ানও গরুগুলোকে একটু জিরেন দিতে চায়। সেও রাজী। বিষ্টুপদ গজগজ করে, বেন্দাও।

ওদের সামনের ওই রং বেরং-এর দল তখনও দূর মাঠের বুকে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। ওরা পেছনে পড়ে রইল।

ও কানিকুড়ো বাঁশীটা বাজাচ্ছিল। ধমকে ওঠে বেন্দা বায়েন তিতি বিরক্ত হয়ে ঃ

—থাম দিকি, এ্যাঁ, থামাবি ও প্যাঁ পোঁ! কেষ্টোর বাশী বে—আধাকে ডাকছেন।

ওর ধমকে থেমে গেল কানিকুড়ো।

বার বার এ পথ দিয়ে গেছে পুরন্দর—অনেকদিনের চেনা পথ। কুয়ো নদী পার হয়ে মামুদপুরের পরই মাটির কাঁচা সরান, বেশ অনেকখানি চওড়া; এককালে আরও চওড়া ছিল, এখন দু'পাশের জমির মালিকদের লোভী কোদাল দু'এক কোপ করে ঝুড়তে ঝুড়তে রাস্তাটাকে ঘায়েল করে ফেলেছে। অনেকখানি গ্রাস করে এনেছে। কোনমতে টিকে আছে রাস্তাটুকু।

এবড়োখেবড়ো মাটির পথ, বর্ষাকালে খালে ডোবায় জল জমে—মাঝে মাঝে এদিক থেকে ওদিকের মাঠে জল যাবার যা দু'একটা সাঁকো

আছে তা ভেঙে পড়ার ফলে মাঠের জল ঠেলে ওঠে রাস্তায়, ছোটখাটো অনেক ভাঙ্গলার সৃষ্টি হয়।

আবার বর্ষার পর দু'দিকে মাঠের দীর্ঘ দিগন্তপ্রসারী সবুজের বুক চিরে চলে যায় রাস্তাটা, কেমন শিশিরভেজা পথ। খালে ডোবায় শালুক শাপলা ফোটে; গ্রামের নিশানা নেই—শুধু কেবল ঢেউখেলানো সবুজ—চোখজুড়ানো সবুজ। ওরই উপর নীল আকাশে কালো ফুটকির মত অলস পাখা মেলে চিল উড়ে যায়। কোথাও কোথাও আউশ ঝুলুর আশ্বিনকাটা ধানে এসেছে সোনালী আভা।

শীতের শুরু থেকে পথের রূপ বদলায়। কাদা আর মাটি গুঁড়ো হয়ে ধুলোর আস্তর জমে। ধানবোঝাই গরুর গাড়িগুলো মাঠ থেকে গ্রামে ফেরে। বাতাসে রাঁধুনীপাগল গোবিন্দভোগ ধানের মিষ্টি সৌরভ। চড়ুইগুলো ঝড়তিপড়তি ধান খেতে ঝাঁক বেঁধে মাঠে নামে, পথের ধুলোয় কিচিরমিচির শব্দে ঝগড়া করে লুটোপুটি ঝটাপটি বাধায়—আবার ধুলোস্নান সেরে ক্ষেতের এদিকে ওদিকে ধানের সন্ধানে ঘোরে।

শাহী সড়ক। কেউ বা গোটা নামটাই বলে—বাদশাহী সড়ক।

গৌড়বঙ্গ থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে চলে গেছে। এককালে এর বুক দিয়ে শাহ, নবাব-সৈন্যদল কুচ করে যেত; রাহী যেত জান মাল সামলে।

তেপান্তরের মাঠ চিরে রাস্তাটা গেছে।

মাঝে মাঝে বিশাল দীঘি, সরাই—মসজিদও চোখে পড়ে। সেই রাস্তা আজ অনেক জায়গায় বিলুপ্ত—হারিয়ে গেছে মাঠের সীমানায়; কোথাও খানিকটা পথ নোতুন করে তৈরী হয়েছে। কনক্রিট কিংবা অ্যাসফাল্টও পড়েছে। আবার কোথাও বা সাবেক কালের সেই নির্জনতা আর শূন্যতা বুকে নিয়ে তিলে তিলে বিস্মৃত গৌরবের নীচে সমাধিস্থ হতে চলেছে।

মহাকালের সঙ্গে পাল্লায় ও হেরে গেছে। তাই আজ গতিবান জীবন থেকে নির্বাসিত—পরিত্যক্ত।

এখনও পথের ধারে অতীতের চিহ্ন নিয়ে বিশাল দীঘিগুলো বুজে মজে টিকে আছে। উঁচু পাড়গুলো উঠে আছে। বিশাল দীঘির বুকে এখনও টলমল করে কাজলকালো জল। চারিদিকে সবুজ পানাড়ি পাতার মধ্যে সাদা বিন্দুর মত ফুলগুলো রোদে কেমন একটা হলুদ সাদা আভা নিয়ে সজীব হয়ে ফুটে থাকে। পানকৌড়ির দল নিশ্চিন্তে ডুব মারে—আবার মাথা তোলে।

ভাঙা নুইয়ে পড়া মসজিদে কোন ইমাম নেই. আজানের সুরও ওঠে না। নির্জন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অতীতের সেই কীর্তি। কোন রাহী নেই সেই আজান শোনবাব জন্য। খিলান গাঁথুনি সব ভেঙে পড়েছে। এদিক ওদিকে দু'চারটে কাঠমল্লিকা গোলকচাঁপা গাছে ফুল ফোটে—আপনা হতেই ফোটে আবার আপনা হতেই খসে যায়, বাতাসে মাটিতে ঝরে পড়ে নির্জনে একান্তে।

ক্বচিৎ কদাচিৎ এ পথে মানুষ যাতায়াত করে।

আজকের দিনের বাতিল পথ। সেদিন এইটাই ছিল সদর –শাহী সড়ক। লোকজন পথিক গাড়ি তাঞ্জাম সবই যেত। কলরব আব জয়ধ্বনিতে ভরে উঠতো ওর আকাশ।

খাপখোলা তলোয়ার হাতে শোভাযাত্রা করে যেত হাবসী খোজা প্রহরীর দল।

আজ তারা সব মাঠের দীঘল ছায়ায় মিলিয়ে গেছে।

রাখাল-বাগালের দল গরু ছেড়ে দিয়ে জিরুতে আসে, নাহয় পুঁটিমাছের ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করে মজাদিঘীতে।

কোন পথচলতি মানুষ এ পথে আসে না। আসবে কেন? আজ এত সময় কারো নেই।

ট্রেন আছে—অন্য দিকে বাস আছে। সবাই কাজের লোক, তাদের সময় কম—কাজ অনেক বেশী। তারা এই হাঁটাপথে - নাহয় গরুর গাড়ির আছাড় খেতে খেতে বাদশাহী সড়কের যাত্রী হতে চায় না

এখান থেকে ছোট রেললাইন এখনও তিন চার কোশ পথ। কোন গ্রাম ও পথে পড়ে নি। শুধু মাঠ—মাঝেমিশেলে দু'চারটে অর্জুন বন, নাহয় আমগাছ, আর ধূধূ পথ। ধোঁয়াচ্ছন্ন গ্রামসীমা শীতের কনকনে বাতাসে হলুদ রোদে কেমন বিচিত্র দেখায়। রোদ কাঁপে নির্জন গাছের পাতায়।

চার কোশের মাথায় এর উপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে ছোট রেললাইন।

তাও ইস্টিশান সেখানে নেই। আছে আমবাগানের ধারে টিনের একটা ছোট চালা। ফাঁকা মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকে—লোক নেই, যাত্রী নেই। ছোট ট্রেনখানা দিনান্তে এদিকে আমোদপুর থেকে কাটোয়া যাবার পথে একবার এখানে দয়া করে দাঁড়ায় মাত্র।

ওই দাঁড়ায়, আবার চলতে থাকে।

দু'চারজন যাত্রী যদি নামে তারাও দিন বেলাবেলি আশ্রয়ের আশায় চলে যায় দূরদূরান্তরে গ্রামের দিকে।

জনহীন হয়ে পড়ে থাকে ধুলোঢাকা শাহী সড়ক—ওই পথটা —অসীম নিঃস্বতা বুকে নিয়ে।

বাতিল জীবনের মতই ওর আজ কোন দাম নেই এ যুগের কর্মব্যস্ত মানুষের কাছে।

একদিন যে গৌরব যে প্রয়োজন যে জীবনস্রোত তার ছিল সেটুকু নিঃশেষে হারিয়ে গেছে—বুজে গেছে।

তাই এ পথ দিয়েও যারা আসে তারা ক্লান্ত পদক্ষেপে কোনরকমে জীবনের বোঝা টেনে চলে মাত্র, তাদের চেহারাও পথের ক্লান্তি আর ধুলোয় মলিন। পথ চলবার উৎসাহও তাদের অজানা আতঙ্ক আর হতাশায় ফুরিয়ে গেছে। এ পথ চলায় কোন আনন্দ নেই।

চলতে হবে তাই চলা।

পথ ফুরোনো।

পুরন্দর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। এখনও অনেক পথ বাকী। বৈরাগীতলা অনেকদূর।

মুরুটের গ্রামসীমা আকাশের গায়ে একটা কালো রেখার মত লেগে আছে। রোদ চড়চড় করে—দীঘির ধারে বটগাছের ছায়ায় ওরা এসে থামল।

ঢুলিদার বেন্দা একটা ময়লা তেলচিটে কাপড়ে ঢাকা ঢোলটা গাছতলায় নামিয়ে একটু হাত দিয়ে এদিকে ওদিকের চামড়ার ছাউনিটার তাপ পরখ করে বেশ বিরক্তিভরা স্বরে বলে ওঠে—মানুষের চামড়া নাহয় সইতে পারে, কিন্তু গরুর চামড়া যি তেতে ফাল হইছে গো। পাঁচ টাকার কেত্তন করতে গিয়ে দশ টাকার খোল যাবে—সী হবে নাই। এই বসলাম। যেতে হয় তুমি একাই যাও। কিবে পদা?

পদা দলের সানাইদার। সেও মনে মনে এতক্ষণ তেতে ফাল হয়ে উঠেছিল। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি, শুধু মনে মনেই গজগজ করছিল। বেন্দার মতলব দেখে সানাই-এর মত একটানা পোঁ ধরে:

—তা যা বলেছ। শালা, হেঁটে বুকদম লেগে গেছে। হেঁটে সানাই-এ ফুঁ দোব কি করে তাই ভাবছি। বললাম ওস্তাদকে কত করে, চলো কান্দী থেকে বাসে করে চলে যাই সাঁইথে, সেখান থেকে আমোদপুর হয়ে ছোট লাইনের গাড়িতে ফুটিসাঁকো। কেমন বাবুর মত যাবা—

বেন্দা ঢোলের তেহাই দিতে অভ্যস্ত। তাই যুৎমত কথার ঘাও মারতে পারে। ফোঁস করে ওঠে:

—প্যাটে ভাত নাই জলে কপ্পূর। যি অমব পুতুলনাচো দল তার আবার অ্যালগাড়ি! হাঁটতে হাঁটতে পায়ের শির ছিঁড়ে গেছে কিলা। কই রে কানিকুড়ো—দীঘি থেকে ঘটিখানেক জল আন দিকি কপ্ করে, তিয়াস লেগেছে।

কানিকুড়ো ওরফে কুড়োরাম পুঁটুলি থেকে ইতিমধ্যে এনামেলের তোবড়ানো একটা ঘটি বের করে দীঘির দিকে ছুটেছে।

ছেলেটা কাজের আছে। ফুটফরমাশ খাটে—এটাসেটা করে আর দলের সঙ্গে কাঁসি বাজায়।

ওদের জন্যই থামতে হল আপাততঃ, চাট্টি খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে আবার পথ চলতে সুরু করবে তারা।

পুরন্দরের পথ চলাটায় এই বয়সে বেশ কষ্ট হয়। বয়স কম হল না। নেহাত শক্ত বাঁধুনি আর ছেলেবেলা থেকেই বাইরে বাইরে ঘোরা অভ্যেসটা আছে বলে কোনরকমে এখনও টিকে আছে কিন্তু আর বোধহয় ধকল সইতে পারবে না।

একদিক থেকে ওই বয়সের আঘাতটাই শুধু বড় নয়—এটাকে ও সামলাতে পারে, কিন্তু অন্যদিক থেকে যে কঠিনতর আঘাত আসছে তাকে সামলাবার শক্তিসামর্থ কোনটাই তার নেই। কিন্তু এ আঘাত একদিন আসবে জানতো, এসেছেও।

তাই ভাবনায় পড়েছে পুরন্দর।

ওই রাস্তার মতই জার্ণ পরিত্যক্ত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে থাকবার ভাবনা জেগেছে মনে। ভয়ও এসেছে পুরন্দরের মনে।

বেন্দা বলে ওঠে :

—ভাতটাত চাট্টি সিজোবো—না এমনিই হরিমটর চিববো গো অধিকারা ?

পুরন্দরের শরীর ভাল নেই। কোন জবাব দিল না সে।

সেই গোপীবাগানের মেলা থেকে স্বর স্বর হয়েছে। রাতের পর রাত জাগা—ফাঁকা মাঠে শীতের কনকনে ঠাণ্ডাও লেগেছে, বুকে পিঠে বেদনা বোধ হয়। পথ চলতে না পেরে মাঝে মাঝে চট বাঁশ সাজের বাক্স বোঝাই গাড়িখানায় উঠে এসেছে পুরন্দর।

খোলা গাড়িতে চিড়বিড় করে রোদ লাগে—কেমন জ্বালা ধরায় সর্বাঙ্গে, তাই নেমেও হেঁটেছে ওদের সঙ্গে। দীর্ঘ আট কোশ পথ সেই শেষরাত থেকে হেঁটে এসেছে, এখনও কোশ চার পথ বাকী, তবে

পৌঁছবে দইদে বৈরাগীতলার মেলায়। পথ যেন আর ফুরোয় না। পুরন্দর গাছতলায় বসে পড়ে চেয়ে থাকে পথের দিকে।

নির্জন ধুলোঢাকা রোদভরা ধূধূ পথ, তার জীবনের মতই ব্যর্থ—শূন্য।

কানিকুড়ো ইতিমধ্যে পরম উৎসাহে এখান ওখান থেকে কাঠ, ভাঙা শুকনো ডাল, পাতা ইত্যাদি জমা করেছে, এখান ওখান থেকে পাথর ইটও কুড়িয়ে এনে কোনরকমে দাঁড় করিয়ে উনুন তৈরি করেছে।

ছেলেটা মহা উৎসাহে দলে ভিড়েছে। এখনও ছেলেমানুষ—বয়স কম। তাছাড়া পথে পথে ঘুরতো—খেতে পেত না পেটভরে। দলে এসে তবু একটু আশ্রয়—একমুঠো ভাতও জুটেছে।

মহা উৎসাহে কুড়ো বলে ওঠে :

—সব উজ্যিগ করে দিছি বেন্দাকাকা, চাপিয়ে দাও দুগ্‌গো বলে'।

পদ সানাইদার সায় দেয় :

—দাও তাই, প্যাটে তো কিছু পড়ুক।

পুরন্দর ঝুরিনামা বটগাছের ছায়ায় একটা চট পেতে বসে পড়েছে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। শান্ত সবুজ ছায়াভরা জায়গাটা পাখীর ডাকে ভরে উঠেছে। শীতের বাতাস মাঠ থেকে কেমন শুকনো একটা আভাস আনে।

তুলোর কম্বলখানা চাপা দিয়ে বসে আছে পুরন্দর।

ওরা ভাত চাপিয়েছে।

এনামেলের হাঁড়ি কড়াই চাল ডাল কিছু আলু আনাজপত্র সঙ্গেই থাকে। দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে—ওরা জেনে শুনেই তৈরী হয়ে এসেছে।

পুরন্দরের ক্লান্তি এসেছে এই জীবনে। পুরন্দরের কেমন ভালো লাগে না আর এই যাযাবরবৃত্তি। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান গরুদুটোকে খুলে খড় কেটে দিয়েছে, ক্লান্ত গরুদুটো খেয়ে চলেছে মশমশ শব্দে ; মাঝে মাঝে ল্যাজ নেড়ে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। আবার খেয়ে চলেছে। শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন।

পুরন্দরও অমনি শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন কাটাতে পারতো ; গ্রামের মধ্যে তাদেরও বাড়িঘর জমিজারাত কিছু ছিল। উপরি কাজও করতো— তাদের জাত ব্যবসা।

জাতে ছুতোর।

ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে দেখেছে র‍্যাদা বাটালি নেয়ানি নিয়ে কাজ করতে। বাবুদের বাড়ির দরজা জানলা টেবিল চেয়ার, এসবই বানাতো আরও লোকজন নিয়ে। বড় ইস্কুলের বেঞ্চি চেয়ার সবই তার বাবার হাতে তৈরী।

পুরন্দর তখন ছোট।

আবছা মনে পড়ে সেই দিনগুলো।

আঁধার বটগাছের ছায়ার নীচে পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে ঠাঁই ঠাঁই রোদ—ছায়া আর রোদ মিলে একটা বিচিত্র পরিবেশ রচনা করেছে। বিচিত্র আলোছায়া মেশা একটি জগৎ।

পাখীর ডাকে ভরা সেই পরিবেশ। মন কেমন করে।

ছেলেবেলার দিনগুলোও ছিল তেমনি শান্ত সহজ আর সুরে ভরা। অনেক পথ পেরিয়ে এসে আজ মিছেমিছি অতীতের দিনগুলোর জন্য মন কাঁদে। সামনের পথ যখন আঁধারে ঢাকা মন ফিরে যায় আলো আর আনন্দের সন্ধানে পিছনের ফেলে আসা দিনের দিকে।

ছেলেবেলা হতেই ছুতোরের ছেলে ওই হাতুড়ি বাটালি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আনমনে এটা সেটা চাঁছে—এটা ওটা করে।

বর্ষার মুখে দেখতো বাড়িতে কাজের ভিড় লেগে গেছে। পিটুলী কাঠ কেটে বাবা পুতুল বানাতো ; বাটালির কয়েকটা আঘাতেই কাঠের ডাল কুঁদে তৈরী হতো গিন্নী পুতুল—কোনটার বা হাত লাগানো হতো আলাদা করে। পুতুল হাতী ঘোড়া আরও কত কি তৈরী হতো মাটির।

মা আর সে নারকেলের মালায় রং গুলে তুলি দিয়ে তাকে চিত্রবিচিত্র করতো।

বাধা দেয় মা ঃ সব নষ্ট হয়ে যাবে, রং লাগাতে জানিস না পুরো।

পুরন্দর বলে—খুব পারবো।

পুরন্দর গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব দেখেছে—মনে মনে শিখেও নিয়েছে। ছোট্ট হাতে তুলি নিয়ে রং করতো, মায়ের নিষেধ সে শোনে নি ঃ

—দেখ না কেমন সুন্দর করে দিচ্ছি, একেবারে জ্যান্ত মনে হবে।

মা তবু বাধা দিত ঃ পড়তে যা। ওসব নিয়েই থাকবি নাকি চিরকালটা ?

হাসতো পুরন্দর। জবাব দিতে পারে নি।

যেন ভাগ্যের নিষ্ঠুর হাসির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতো তার মুখে, ভবিষ্যতের একটি সংবাদ।

আজ বহু বৎসর পর তাই ভাবে পুরন্দর।

সেই পুতুল নিয়েই আছে। পুতুলনাচের দল বানিয়েছিল। আজও সেই ছায়াবাজীর পালা শেষ হয় নি।

—অধিকারী মাশায় ! মাশায় গো !

কানিকুড়ো ডাকছে তাকে। শিশু কণ্ঠের স্বরটা কেমন চেনা পুরন্দরের ; এ যেন তার হারানো কণ্ঠস্বর।

পুরন্দর ছেলেদের ডাকে ফিরে চাইল। অনেক দূর থেকে যেন ফিরে এল আজকের দিনে, এই শূন্য রিক্ত প্রান্তরে।

চারিদিকে একটা অসীম শূন্যতা।

একদিন এই মাঠের চারিপাশে ছিল শরতের বেলায় সবুজ আর সোনাধানের প্রাচুর্য। চারিদিকে ফুটে উঠতো শাপলা শালুক ফুল। বাতাস ভরে উঠতো পাখীর ডাকে।

আজ ধান উঠে গেছে—পড়ে আছে শুধু ফসলের স্বপ্ন নিয়ে ওই রিক্ত প্রান্তর—তারই জীবনের মত শূন্য নিঃস্ব।

কানিকুড়ো ইতিমধ্যে যুৎপাৎ করে চা বানিয়েছে।

চা নামেই। একটু গরম গুড়গোলা জল—তাতে গোটাকতক চা পাতা সেদ্ধ করা। লাল আর কালোয় মেশানো ওর রং। ধোঁয়া উঠছে। গেলাসটা এগিয়ে দেয় ওর হাতে।

তবু জ্বরের পর মন্দ লাগে না ওই গরম স্বাদটা।

তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিতে থাকে পুরন্দর।

—কেমন হয়েছে চা, অধিকারী মাশায় ?

কানিকুড়ো ওস্তাদের শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ছেলেটাকে কেমন যেন অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেছে পুরন্দর। দলের অনেকে ওই নামে তাকে ডাকে। কেউবা বলে অধিকারী। পুরন্দর তাই মেনে নিয়েছে।

যাত্রাদলের নেতার সম্মানও দিত তাকে। পুতুলনাচ তো যাত্রারই সামিল, এতে মানুষে অভিনয় করে—পুতুলনাচে নাহয় পুতুলগুলোই ঘোরাফেরা করে।

তবে পালাগান তারাও গায়।

ছেলেটার কথায় পুবন্দর জবাব দেয়—ভালোই হয়েছে। তুই খেয়েছিস ?

—হ্যাঁ, মুড়ি ছিল কালকের এতের. তাই আর ঝালবড়া খেইচি। তা মেলায় কখন যেয়ে উঠবো ?

কানিকুড়োর খুশি যেন ধরে না। নোতুন জায়গা নোতুন পথ কত নোতুন মেলার লোকজন দেখছে আর তারই মাঝে গ্যাসের আলোয় ওই বাক্সবন্দী কত রকমারি ছোট বড় পুতুল, রাজা-রানী, দৈত্য, রাম-রাবণ-সীতা—আরও কত সব।

এ যেন ভিন্ন জগৎ—তারই ভিড়ে সে হারিয়ে গেছে।

শুকনো গলায় জবাব দেয় পুরন্দর—যাবো সাঁঝ বেলায়।

পুরন্দর ওই ছেলেটার মাঝেই নিজের অতীতের কিছু চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে। অমনি কৌতূহল স্বপ্ন দেখেছিল অনেকদিন আগে একটি

বালক ; তার গ্রামের ছায়াঢাকা বাঁশবনে—পালতে মাদার গাছের বনভরা পথে—পচাডোবার ধারে কত সকাল দুপুরে তার মন ছুটে গেছে তেপান্তরের পারে কোন্ রাজপুত্রের সঙ্গে।

দৈত্যপুরীর মাঝে রয়েছে ঘুমন্ত কোন রাজকন্যা!

আরও কত কাহিনী। সব শোনা গল্পগুলো তার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতো।

আঁধার আর আলোয় মেশামিশি একটা গোয়ালঘরের একদিকে তাদের পুতুল টুকিটাকি যন্ত্রপাতি তোলা থাকতো। সেই ঘুপসি ঘরখানার ভিতর শুরু হয় তার পুতুলরাজ্যের প্রথম স্বপ্ন।

রাম লক্ষ্মণ আর রাবণ, একটা গোয়ালিনী পুতুল দিয়ে সীতাও বানানো হয়েছিল। প্রথম খেলার কথা তার মনে আছে।

খেলার কথাটা প্রথম তার মনে আসে সেবার রায়বাবুদের পূজোয় পুতুলনাচ দেখে।

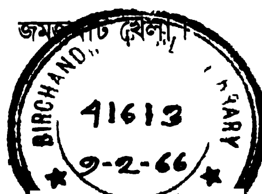
কোথাকার দল জানে না, কি তাদের নাম তাও মনে নেই পুরন্দরের। আবছা মনে পড়ে রাজা আর দৈত্যের যুদ্ধ। নীল রং করা মোষের শিং লাগানো মাথা—শুনেছিল পরে ওই নাকি মহিষাসুর। খুব ভালো লেগেছিল, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল পুরন্দর।

ওই রকমারি পুতুলের নাচ—হাত পা মাথা নেড়ে নাচছে, তরওয়াল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ আর সেই সঙ্গে বক্তৃতা-গান-বাজনা আর গ্যাসের আলো—কত লোকজনের ভিড়! একটি শিশু মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল ওই দিকে।

সব মিলিয়ে কেমন একটা স্বপ্নের সুর জেগেছিল পুরন্দরের মনে।

পুতুল আর পুতুল! রকমারি পুতুল। কাঠ, কোনটা বা ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী—রং করা সুন্দর পুতুল। তার মা—সে এর চেয়ে অনেক ভালো রং করতে পারে—চোখ আঁকতে পারে। পুরন্দরের মনে কেমন যেন একটা আশা জাগে।

ক'দিনই পুতুলনাচ চলেছে গ্রামে। জমজমাট খেলা।


BIRCHAND... LIBRARY
41613
9-2-66

এপাড়া ওপাড়া—এখানের চণ্ডীমণ্ডপে বাজারপাড়ার কালীতলায় আরও অনেক জায়গায় নাচ দেখিয়েছে তারা। সর্বত্রই নীরব দর্শক ওই পুরন্দর গেছে—দেখেছে।

শিশুমনের পরতে গেঁথে যায় ওই পালার প্রতিটি ঘটনা।

নাচের সময় মাঝে মাঝে কাপড়ের পর্দার ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী দু'চোখ মেলে দেখেছে পুরন্দর কি করে তারা অনড় অচল পুতুলগুলোকে সচল করে তুলেছে।

আলো-বাজনা-গানএর সুর, পালার বাঁধুনি সব দেখেছে শুনেছে। মনে একটা দুর্বার আশা জাগে—সেও শিখবে ওই পুতুলনাচ।

···অধিকারী মশাইএর খোঁজ করে একদিন সকালবেলায় বাজার-পাড়ায় তাদের বাসাতেও গিয়ে হাজির হয় পুরন্দর।

একটা খড়ের ঘর, সেইটাই পুতুলনাচের দলের অস্থায়ী আস্তানা। লোকজন নানা কাজে ব্যস্ত, কেউ বা রান্না চাপিয়েছে। পুরন্দর গিয়ে ঢুকলো উঠানে।

এদিকে ওদিকে পড়ে আছে হাত-পা কাৎ করে উলটে-পালটে কালকের,আসরের ভেলকি লাগানো অনেক পুতুল, রশি দড়ি লাগানো এদিক ওদিকে। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে এগিয়ে যায়।

অধিকারী মশায় জাঁদরেল লোক।

খালি গা করে হুঁকো টানছে আর একজন টহলী তাকে তেল মাখাচ্ছে। নধর কালো কুচকুচে দেহের রং হুঁকোর রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। পানের ছোপে দাঁতগুলো তরমুজের বীচির মত কালো, আর কণ্ঠস্বর ওই যাত্রাগান করে এবং দ্রব্যবিশেষের ধোঁয়ায় তলদা বাঁশের মত নিরেট ভরাটি হয়ে উঠেছে। ওকে দেখে হেঁকে ওঠে :

—কি চাই ? প্রয়োজন ?

দাবড়ানির চোটে ছোট্ট পুরন্দর ঘাবড়ে গেছে।

পুতুলের মহিষাসুরের মত লোকটার চেহারা, আর তেমনি নাশ। মাথায় শিংদুটো শুধু নেই।

ওর বাজখাঁই গলার শব্দে একটু হকচকিয়ে যায়। কোনরকমে সামলে উঠে পুরন্দর বলে :

—পুতুলনাচের দলে নেবেন? আমি পুতুল তৈরি করতে পারি, রং দিতে পারি।

সন্ধানী চোখে অধিকারী মশায় ওকে আপাদমস্তক দেখছে।

ছেলেবেলায় পুরন্দরের চেহারাটা ফরসা একটু গোলগাল ছিল। অধিকারী মশায় খনখনে গলায় হেঁকে ওঠে :

—মদনা, এদিকে আয় তো।

মদনা নামক পদার্থটিকে দেখে পুরন্দরের ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। এ যদি মহিষাসুর তো মদনা গোঁফগজানো তাড়কা রাক্ষসী।

অবিনাশ অধিকারী বলে ওঠে :

—ছোঁড়াকে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে তোল, পুতুলনাচ দেখাতে আসবে বলছে। ওকেই পুতুল করে নাচানো যাবে, দেখ দিকি।

মদনা ইতস্ততঃ করছে।

জ্যান্ত পুতুল নাচ! সেটা ঠিক ধাতস্থ করতে পারে না সে। পুরন্দরও অবাক হয়ে গেছে ওর কথায়।

ধমক দিয়ে ওঠে অধিকারী পুরন্দরকে :

—অর্বাচীন বালক! পুতুলনাচ শিখবে? এতই সোজা! ছেলেখেলা নাকি? বালখিল্য ব্যাপার এটা, এ্যাঁ?

মহিষাসুর যেন এইবার শিংএ মাটি মাখাচ্ছে—তারপরই ঠেলেঠুলে উঠবে ধ্বংস করতে।

বিশাল বপু নিয়ে ঠেলে ওঠবার আগেই কি যেন একটা ঘটে গেল। অবিনাশের হুঙ্কারের চোটে ছিটকে এসে রাস্তায় পড়ে জোর পা চালিয়েছে। পিছনে কে যেন আসছে। চেয়ে দেখবার সময় নেই। অনেকক্ষণ পর আবিষ্কার করে পুরন্দর একদৌড়ে অনেকখানি পথ পার হয়ে এসেছে, একেবারে খাজারপাড়া থেকে সোজা তাঁতিপাড়া অবধি দৌড়ে এসেছে সে।

নিরাপদ ঠাইএ এসে দাঁড়ায়।

তখনও হাঁপাচ্ছে ভয়ে—উত্তেজনায়।

কিন্তু মনে মনে পুতুলনাচের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। খানিকটা দেখেছে সে ওদের পুতুলনাচের কায়দা। মাথায় খেয়ালও এসেছে।

ছুতোরের ছেলে—একটা চেষ্টা সে করবেই। একটা কিছু খাড়া করতে পারবে। তারই তোড়জোড় শুরু করে।

…তাই নিয়েই পুরন্দর নানা কলকৌশলের কথা ভাবছে। অনেক চেষ্টাচরিত্তিরও করেছে। ইতিমধ্যে দড়ি কাঠকুটোও যোগাড় হয়ে গেছে। তৈরি হয়েছে কয়েকটা পুতুল।

ইস্কুলে যায় পুরন্দর, কয়েক ক্লাস উপরেই পড়ছে। ক্লাসে পড়ানো হয়েছে রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্পও। মনের চোখে তাদের অনেক চরিত্রই ঘটনাই জীবন্ত হয়ে ওঠে নিত্য নূতন পুতুলের রূপে।

তাই নিয়ে কাজ করে চলেছে পুরন্দর।

গ্রামের শেষপ্রান্তে তাদের বসতি—আশেপাশে কিছু লোকালয়, তাঁতি এবং নাপিতদেরই বাস—তারপরই ছোট খালের ধারে মুসলমান-পাড়া—ওদিকে নারকেল বাগান।

ওই তার প্রথম পৃথিবীর সীমানা। তারই মাঝ থেকে বন্ধুবান্ধব সহকারীও পাওয়া গেল। গাইয়েও জুটে গেল, ন্যাড়া নাপিত।

তিনকুলে ওর কেউ নেই—মামার ঘরে পোষ্য; সঙ্গী তার একটা ঘিয়েভাজা কুকুর। যাত্রার দলে সখী সাজে আর সেই সুবাদে দু'চারটে গানও শিখেছে ন্যাড়া।

কি গান—কি তার মানে তা পুরন্দরও ভাবে না, ন্যাড়া তা জানেও না। হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচে ন্যাড়া গানের তালিম দেয়—তালে বেতালে পা ফেলে নাচে মাঝে মাঝে :

এসো হে প্রাণপ্রিয়
পরানে তুলে নিয়ো
আমার এ গাঁথা মালাখানি।

খুশী হয় দেখেশুনে পুরন্দর। খুব ভালো নয়, তবে পুরন্দরের আপাততঃ ওতেই কাজ চলে যাবে।

অনেক উদ্যোগের পর প্রথম পুতুলনাচের আসর জমালো পুরন্দর।

সেই দিনটা তার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন।

ছেঁড়া ন্যাকড়া আর কিছু চট দিয়ে গোয়ালের চালাতে আসর করা হয়েছে। উপস্থিত হয়েছে কয়েকজন বিশেষ দর্শক।

তাঁতিদের রামপদ, পটলা, বসন আর যুগীদের ললিতা। ললিতাকেই ভয়। গেছো মেয়ে—মা বাপ কেউ নেই। কোন এক দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বানে ভাসা খড়কুটোর মত এসে ঠেকেছে। কালো ডাগর দুটো চোখ দুষ্টুমিতে ভরা, আর তেমনি বেবশ। সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। আর তেমনি ডাকাবুকো মেয়ে। সব খবর রাখে।

সুতরাং সে এ খবর জেনেছে সবার আগে এবং এসে হাজির হয়েছে বিনা নিমন্ত্রণেই। অবশ্য নিমন্ত্রণের অপেক্ষা সে রাখে না।

যথারীতি শুরু হল পুরন্দরের পুতুলনাচ, আর ন্যাড়ার সেই সখী সখী গান। তারপরই তাড়কা রাক্ষসী আর রামের যুদ্ধ এবং তাড়কার পতন ও মৃত্যু।

···ততক্ষণে গানের সাড়াশব্দ পেয়ে অনেকেই এসে জুটেছে—পুরন্দরের বাবা মাও। পুরোর মা ছেলের কাণ্ড দেখে তো হেসেই কুটোকুটি!

পুরন্দরের কেমন লজ্জা লাগে।

তবু মনে তার দুর্বার আনন্দ, হাতের দড়ি টেনে কেমন রাম-তাড়কার যুদ্ধ করিয়েছে, প্রাণ এনেছিল মরা পুতুলে।

ওরা তার নিজেরই সৃষ্টি! পুরন্দরের বুক খুশীতে ভরে ওঠে।

···পুরন্দরের নজর ছিল ওই ললিতার ওপর। বড্ড চোর মেয়েটা, হাতটান। পুতুল—কাপড়ের টুকরো—একটুকু রাংতা যা পাক তাই কোনরকমে নিয়ে পালাবে সে, গোপনেই হোক আর প্রকাশ্য দিবালোকেই হোক সে নিতে মন হলে নেবেই এবং চুরি ধরা পড়লে একরাশ চুল সিংহের কেশরের মত ফুলিয়ে বলবে—নিইছি, বেশ করেছি।

অর্থাৎ, তার করণীয় নিত্যকৃত্যেরই সামিল।

কালো. কাঁচ-কাঁচ রং, চোখদুটো ভারি সুন্দর। নাকটা টিকলো। পুরন্দরও মাঝে মাঝে বলে ঃ

—তোকে দেখতে ঠিক কাঁচকড়ার পুতুলের মতন। ভারি সোন্দর চোখ-নাক। তবে বড্ড চোর তুই! ছ্যাচড়া চোব।

—ধ্যাৎ! ললিতার অবশ্য ওই অপবাদে কিছু আসে যায় না।

আজ সেই ললিতাও পুতুলনাচ দেখতে এসেছিল। আসবার পথে কার গাছের মাদার সংগ্রহ করে এনেছিল ক'টা। তাই চিবোচ্ছে আর মাঝে মাঝে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছে চুপ করে, যেন তাক খুঁজছে। ও জানে সবই একটা গোলমালে পরিণত হবে। আর লুটোপুটির মধ্যে সে-ও একফাঁকে এগিয়ে গিয়ে দু'চারটে পুতুল তুলে নিয়ে দৌড়বে। এখান থেকে একবার বেরোতে পারলে আর তাকে পায় কে? পুতুলগুলো মন্দ করে নি পুরন্দর।

ওগুলোর উপর নজর দিয়ে চুপচাপ ওই ললিতা ধূর্ত মেনি বেড়ালের মত বসে আছে, আর আধপাকা নোনাআতায় কামড় বসাচ্ছে।

ন্যাড়ার গান শুনে প্রথমে হাসছিল সে, বেজায় হাসি। ছেলেটা কেমন মেয়েদের মত নেচে নেচে গান গায়; খিলখিলিয়ে হাসছিল ললিতা।

ধমক দিয়ে ওঠে রামপদ ঃ এ্যাই!

—খুব অস্যি রে!

তাকেও কথা শোনাতে ছাড়ে না ললিতা ঃ এ্যা, খুব ভাল লাগছে বুঝি! এ্যা!

—ভালই তো! রামপদর ওই গান আর নাচ ভালো লাগে। তাই সে সাফা জবাব দেয়।

ললিতা মাথা নেড়ে বলে ঃ

—তবে আর কি, ঝুমরির নাচ দেখগা মেলায়, আরও ভালো লাগবে। ললিতা ও কথাটা বলতেই থেমে গেল রামপদ।

ঝুমরিদের নাচ এক-আধটু লুকিয়ে ছাপিয়ে চোখে দেখেছে, ব্যাপারটা ঠিক বোঝে নি। ' আবছা রাতের অন্ধকারে মেলায় আমবাগানে দেখেছে হ্যারিকেন ঝুলতে। মাঝ-আসরে ঢোল বাজে আর রং-চং মেখে মেয়েরা সেজেগুজে নাচে আর গান গায়। বিশ্রী গান।

হাঁ করে কাতারে কাতারে লোক তাই শোনে, বাহবা দেয়। পয়সা দেয়। কেমন ঘিনঘিনে একটা ব্যাপার। কি সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে সেটা যে ভালো নয় মোটেই, এটা বেশ জেনেছে রামপদ।

ললিতার মুখে আবার সেই কথাটা শুনে চুপ করে গেল সে।

পুরন্দরের পুতুলনাচ শুরু হয়েছে।

ললিতাও অবাক হয়ে দেখছে। বাবুদের বাড়িতে যে পুতুলনাচ দেখেছিল, এ যেন ঠিক তারই মত। তেমনি সুন্দর আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওরা।

ঠিক এমনি কিছু দেখবে ভাবতে পারে নি ললিতা।

অবাক বিস্ফারিত হু'চোখ মেলে ললিতা চেয়ে থাকে। পুতুলনাচ তার সত্যই ভালো লেগেছে।

—কেমন দেখলি ?

পুরন্দর ওকে জিজ্ঞাসা করে।

বাড়ি ফিরছে ললিতা।

আবছা অন্ধকার নেমেছে গাছগাছালি আর বাঁশবনের নীচে। কেমন ঝিঁঝিডাকা অন্ধকার। হু'-একটা তারার আলো জ্বলে ওঠে।

মুখআঁধারি পথে ফিরছে ললিতা।

মনে মনে পুরন্দরের প্রতি একটা স্তব্ধ শ্রদ্ধা জেগেছে। এতবড় ব্যাপারটা সে ঘটাতে পেরেছে। বাজারের দেখা সেই নামকরা পুতুল-নাচের মতই লেগেছে খানিকটা।

ওকে দেখে দাঁড়াল ললিতা। বহুকষ্টে সংগৃহীত নোনাআতার আধখানা তুলে দেয় পুরন্দরের হাতে।

—এই নে। খুব মিষ্টি, খেয়ে দেখ।

—তোর এঁঠো ?

ললিতা বলে ওঠে—কেন, খেতে নাই ?

কি ভেবে পুরন্দর ওটা হাতে নেয়, পুরুষ্ট আতাটায় সন্তর্পণে কামড় দিয়ে চলেছে। কথাটা আবার জিজ্ঞাসা করে পুরন্দর ঃ

—কই, বললি না কেমন লাগল পুতুলনাচ ?

ললিতা যেন বেশ আদর করেই কথাটা বলে ঃ

—খুব ভাল। আমার ঢেক পুতুল আছে, তোকে দোব।

—ও পুতুলে পুতুলনাচ হয় না, নতুন পুতুল করতে হবে। কিন্তু রামায়ণ একটা পেলে ভালো পালা বাঁধতাম।

পুরন্দর আজকে বেশ উৎসাহ পেয়েছে।

পুরন্দর বড় ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে। বাংলা মানসাঙ্কে বেশ দড়। বাবার আশা ছেলেকে পড়াবে—সে পাস করে জাতব্যবসা ছেড়ে চাকরি-বাকরি শুরু করবে। এপথে আর আনবে না ছেলেকে।

এতে আর পয়সা নেই। র‍্যাঁদা ধরতে দেবে না ছেলেকে।

কিন্তু ওসব খবর রাখে না পুরন্দর, সে তার পুতুলের নেশায় মত্ত।

মনে মনে একটা জেদ চেপে গেছে অবিনাশ অধিকারীর চেয়েও ভাল দল বাধবে সে। সেদিনের অপমানটা ভোলে নি পুরন্দর। এর শোধ একদিন সে নেবেই।

মোষের মত লোকটা তাকে তাড়া করেছিল—পুরন্দর যেন পুতুলনাচ শিখতে চেয়ে ওর খ্যাতিতে ভাগ বসাতে গিয়েছে, নাহয় স্রেফ ভাতেই হাত দিয়েছে।

এবার তাই দেবে সে।

ললিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে। পুরন্দর কি ভাবছে। মুখে সেই চিন্তার ছায়া।

কেমন যেন নতুন করে আজ ভালো লাগে পুরন্দরকে।

কালো ডাগর দু'চোখে কি কচি স্বপ্ন আর মমতা জড়ানো! অজান্তেই তার আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দুরন্ত মেয়েটা।

ওর কাজে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করবে ললিতা। এই ভেবেই বলে ওঠে—রামায়ণ-মহাভারত আমি এনে দোব তোকে।

পুরন্দর অবাক হয় এই সাহায্যের কল্পনায়।

—কোত্থেকে আনবি?

ললিতা মাথা নাড়ে, চুলগুলো সামলে নিয়ে বলে:

—সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোর পেলেই হলো তো?

পুরন্দর কথার জবাব দেয় না। মনে মনে আশা করে হাতেই এসে গেছে বই দুটো; দূর থেকে দেখেছে কত ছবি আর পদ্যে ভরা বইগুলো।

দুজনে আনমনে পথ চলছে।

দুটি নতুন মন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটি অদৃশ্য সূত্রে যেন বাঁধা পড়েছে।

মনে মনে কি ভাবছে ললিতা। কোথায় ও বস্তু পাওয়া যায় তা জানে সে এবং সেখান থেকে যে-ভাবেই হোক সে আনবে।

পুরন্দর খুশীতে ফেটে পড়ে। এ তার বহুদিনের স্বপ্ন।

নিজের সংগ্রহ বলতে কিছুই নেই। মাত্র স্কুলের দু'চারখানা বই ছাড়া। তাও পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে আনা।

দেখেছে অনেকের বাড়িতে বড় রামায়ণ, কত ছবি আঁকা। তাই একটা পাবে সে। নিজে পড়তে পাবে ওই বই। কত গল্প আর পালা-গান আছে তাতে।

ললিতার দিকে খুশীভরা চোখে চেয়ে থাকে।

—সত্যি?

পুরন্দর যেন এই ভাগ্যে বিশ্বাস করতে পারে না।

—হ্যাঁ তো কি! ললিতা মাথা নাড়ে।

হঠাৎ যেন ললিতার খেয়াল হয় অনেক রাত হয়ে গেছে। দৌড় মেরে চলে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যেই।

পুরন্দর বাড়ির দিকে ফেরে।

বাবা তার অপেক্ষাতেই বসে ছিল। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর হু'-এক ঢোঁক তাজা পানীয় তার চাই। না জুটলেই বিগড়ে যায় লোকটা, গেছেও। আজ দেখেছে সে, ছেলে কি কর্ম করছে র‍্যাদা-তুরপুন-বাটালি নিয়ে। অনেক আশা ছিল তার পুরন্দর পাস করবে। তারপর একটা চাকরি ধরবে। সব আশাতেই কেমন যেন ছাই দেবে ওই ছেলে। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ফকীর যে জাতব্যবসায় আর পেট ভরে না। সারাদিন বাটালি-নেয়ান-হাতুড়া ঠুকেও সে আজ সংসার চালাতে পারছে না।

ছেলেকে এ পথে আসতে দেখে মনে মনে চটেছিল, মুখে কিছু বলে নি। আজ এই পথে একধাপ এগিয়ে যেতে দেখে চটে আগুন হয়ে আছে। একবার দেখে নেবে ছেলেকে। পুরন্দরকে দেখে সে এগিয়ে আসে।

খপ করে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিতে থাকে। মদ না খেতে পারার বাগটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে ফকীরের সারা মনে। গজরায় সে।

—নাটা আমার অধিকারী হবেন! পুতুলনাচ করছে—এ্যা! দোব সব বিবাকু উনুনে পুরে। পড়া গেল, শোনা গেল—পুতুলনাচ!

কথা বলে না পুরন্দর। নীরব অভিমানে টসটস করে চোখ দিয়ে জল পড়ে মাত্র। হ্যারিকেন জ্বেলে পড়তে বসল বাবার মারটা নীরবে হজম করে। বড় হয়েছে। মনে মনে গজরায়।

কি অন্যায় করেছে ঠিক বুঝতে পারে না সে।

মা-বাবার কথাটা কানে আসে। মা আড়ালে বাবাকে বলছে:

—নাই বা মারতে ছেলেটাকে। খাবাপ তো কিছু করেনি।

ফকীর ফোঁস করে ওঠে:

—করেনি, করবে এইবার। ওসব বখামি।

—ছেলে বড় হয়েছে, মারধোর নাই বা করলে।

ফকীর গজগজ করে:

—এইসব করে বেড়াবে, বললেই দোষ! এ্যাঁ!

মা ঠিক বুঝতে পারে না এর মধ্যে বদমাইশি থাকতে পারে কোন্‌খানে। ভালোই লেগেছিল তার। তার পুরন্দর এমনি কারিগর হয়েছে। এত কাণ্ড শিখেছে, এটা মায়ের কাছে ভালোই লেগেছিল।

বাবা বলে চলেছে—জানো না তুমি, অকাজ ওসব। পুতুলনাচ, মেলাখেলায় বেড়ানো—ওই বাজে লোকদের সঙ্গে মেশা!

মা হাসে: পড়ছে। ও ছেলের ওসব হবে কোত্থেকে! বাড়িতেই থাকে, ইস্কুলে যায়।

কথাটা মানে না ফকীর। মাথা নাড়ে।

—কচুগাছ কাটতে কাটতেই মানুষ কাটে সে।

মা ওসব কথা ঠিক বোঝে না। সে এটাকে আমলই দেয়নি।

ইস্কুলে যায়, পড়াশোনা করে পুরন্দর। ছেলেমানুষেব ঝোঁক, ক'দিনেই একটু মিইয়ে যায়। চাপাপড়া আগুন নিভে আসে। পুতুলনাচের ঝোঁকও আপনা হতেই চলে যাবে।

কিন্তু সেই ছাইচাপা আগুনটাকে যেন উসকে দেয় ললিতা। ক'দিন তক্কে-তক্কে ছিল। এবাড়ি-ওবাড়ি সর্বত্রই তার অবাধ গতি। দু'চোখেব দৃষ্টি চলে সর্বত্রই। সুতরাং ও-বস্তুর সন্ধান পেতে দেরি হয়নি তার।

ও-পাড়ার বামুনপিসীর কুলুঙ্গিতে অনেকদিন ধরেই দেখেছে বামায়ণটাকে; বিশেষ ব্যবহারে লাগে না ওটা, তোলাই থাকে। নাড়াচাড়াও কেউ করে না। মনে মনে বুদ্ধি কষে ফেলে ললিতা।

ক'দিন সেইখানেই যাতায়াত শুরু কবেছে সে।

তার পাকা চুল তুলে দেয়, এটা-সেটা করে দেয়।

বামুনপিসীও বেইমান নয়; দু'-একদিন প্রসাদ দেয়—কোনদিন বা চাট্টি মুড়ি। ললিতাও ওর জন্য তুলে নিয়ে যায় ডোবা থেকে কলমী-হেঞ্চা শাক। এটা-সেটা। এবং তাক খোঁজে দুপুরে কখন ঝিমুনি আসবে বুড়ীর। সুযোগও মিলতে দেরি হয় না ললিতার।

ক'দিন পরই পুরন্দর পড়ছে, দুপুরবেলা। রোদ-মাখা গাছ-গাছালি।

বাবা বাড়িতে নেই, কোথায় কাজে গেছে। মা-ও ঢেঁকিশালে চিঁড়ে কুটছে। এই ফাঁকে চুপি চুপি ললিতাকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইল পুরন্দর।

—কিরে? একটু অবাক হয় ওকে অমন করে ঘরে ঢুকতে দেখে

ডুরে শাড়ি একটা পরেছে ললিতা। কপালে কাঁচপোকার টিপ। কেমন সুন্দর পুরুষ্ট দেহটা নেশা আনে।

ছ'চোখের চাহনিতে একটা সাবধানী সন্তর্পণী দৃষ্টি। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা করে ললিতা—চুপ কর।

পুরন্দর অবাক হয়ে ওকে দেখছে। কেমন হেঁয়ালির মত লাগে মেয়েটাকে। ভালো লাগে। সুন্দর আর তেমনি তুর্দম। বেবেশও।

এদিক-ওদিক চেয়ে ওর কাছে এগিয়ে আসে ললিতা।

—কি বলছিস?

কথা বলে না ললিতা।

শাড়ির আড়াল থেকে বের করে মোটা মলাট-লাগানো বইখানা। ওর হাতে তুলে দেয়। হাসছে ললিতা।

—এই নে!

পুরন্দরের ছ'চোখ খুশীতে ফেটে পড়ে।

—দেখি! শশব্যস্তে ওলটাতে থাকে পাতাগুলো। কত সুন্দর ছবি—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ! চাপাপড়া সেই আগুনটা আবার মনের মধ্যে একটু একটু করে জ্বলে ওঠে। পুরন্দর খুশীভরা কণ্ঠে বলে ঃ

—কোথায় পেলি?

কাছে সরে এসেছে ললিতা, খুব কাছে।

ওর সারাদেহের একটা মিষ্টি সৌরভ ওর নাকে লাগে—চুলগুলো লাগে গালে। কেমন যেন নীরব নিবিড় চাহনি। ললিতা বলে চলেছে ঃ

—ভালো ভালো পুতুল করবি। অনেক পুতুল, বুঝলি?

ললিতা তাকে যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের পথ দেখিয়েছে।

পুরন্দরের সারা মনে একটা ঝড় উঠেছে। দুপুরের রোদপোড়া মাঠ—দূরে ছায়াকালো অধিকারী-বাগানের পরই ময়ূরাক্ষীর উঁচু বাঁধটা যেন আকাশে মিশেছে। ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশপারের কোন্ রাজ্যের স্বপ্ন।

পাখী ডাকছে পালতে মাদার আর বাঁশবনে। সবুজ আর হলুদ একটা আলোভরা স্বপ্ন। ওর দিকে চেয়ে আছে পুরন্দর। মনের একটা নীরব সুরকে সঞ্চারিত করে তুলেছে ওর সাহায্য দিয়ে।

কেমন খুব ভালো লাগে ললিতাকে। একখানা হাত ওর হাতে। সারা শরীরে একটা তৃপ্তির সাড়া। ললিতা কেমন বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ললিতা উঠে দাঁড়াল। সে যেন চমকে উঠেছে। পাখীটা কোথায় বাঁশবনের আড়ালে তখনও ডেকে চলেছে।

দু'চোখে ললিতার সেই বৈচিত্র্য আর স্বপ্নভরা চাহনি।

—আমি যাই, কাউকে বলিস না কিন্তু।

হাতখানা সরিয়ে নিল ললিতা। পুরন্দর কথা দেয়।

—না।

ললিতা চলে গেল সাড়া না তুলে।

পুরন্দর আজ প্রথম আবিষ্কার করে একটা নিভৃত গোপনতা। এমন কিছু রয়ে গেল, যা জানে মাত্র তারা দু'জন। ওই বেবশ মেয়েটাও কেমন শান্ত স্তব্ধ হতে জানে, এ এক রহস্য ঠেকে তার কাছে।

একটি অদৃশ্য বাঁধনে আজ তারা বদ্ধ হয়েছে—সে আর ললিতা।

আবার পুতুল নিয়ে পড়ে।

বাড়িতে বাবাকে লুকোনো সোজা, সাবধান হয়ে গেছে পুরন্দর সেই রাত্রের ঘটনার পর থেকে। বাবা কাজ করে সন্ধ্যাবেলায় মদ পেলেই খুশী। পুরন্দরও গোপনে তার কাজ শুরু করেছে।

স্কুলে যায়—পড়াশোনাও করে। পরীক্ষায় পাস করাটা তার কাছে খুব কঠিন বলে মনে হয় না। এত বেশি না পড়লেও চলে তার।

বইয়ের মধ্যে দু'চারখানি অন্য বইও জুটেছে। সযত্নে রেখেছে সেই রামায়ণখানা। কেমন ধোঁয়াটে গন্ধ বের হয় ওর থেকে। অনেক রহস্যমাখা কোন স্বপ্নলোকের আভাস আনে সারা মনে।

বাঁশবনের মাঝে একটা নিরালা জায়গাতে বসে বইখানা দেখে—পড়ে। কি সব ভাবে। পিছনের গোয়ালঘরে পুতুলের সরঞ্জাম রেখেছে।

সিন্ধুমুনির পুত্রবধ-কাহিনীটা পড়ছে গোয়ালঘরে সেদিন।

অন্ধমুনি আর মুনিপত্নী। দুজনেরই নির্ভর একটি মাত্র সন্তান। বেদেপাড়ার আজাহারকে পট খেলাতে দেখেছে, ওই সিন্ধুমুনির পট। গানও বেঁধেছে ভালো, সুর করে গায় আজাহার। গানটাও শুনেছে পুরন্দর।

—মাঠের মধ্যে বট বিরিঞ্চি
সেই তো মাঠের মাথা ;
একলা মায়ের পুত্র মলে
মা দাঁড়াবে কোথা ?

·· দশরথ রাজা গহন বনে শিকারে গেছে। বিশাল বন। পাতা পড়লে কুলো, আর ডাল খসে পড়লে হয় ঢেঁকি। তেমনি বনে ঘুরছে রাজা। সারাদিন কোন শিকার মেলেনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুনিপুত্র মা-বাবার জন্য জল আনতে গেছে।

নদীতে জল ভরছে কলসিতে, একটা শব্দ উঠছে। জল ভরার শব্দ।

চমকে ওঠে দশরথ—কোন মৃগই জলপান করছে। উত্তম শিকার। অন্ধকার রাত্রি—দৃষ্টি চলে না। ধনুকে জুড়ল শব্দভেদী বাণ। অব্যর্থ সন্ধান তার। তীর গিয়ে বিঁধেছে লক্ষ্যে।

লুটিয়ে পড়ল মুনিপুত্র।

পুরন্দরের দু'চোখ জলে ভরে আসে। মনের চোখে ফুটে ওঠে ছবিগুলো, একটার পর একটা। কেমন করুণ দৃশ্য। ঠিক ফোটাতে পারলে চোখে জল আসবে।

—পুরো !

হঠাৎ কার ডাক শুনে জানলার দিকে চাইল। ললিতা।

পুরন্দর গোয়ালের পিছনের চালায় আপনমনে পুতুল বানিয়ে চলেছে। তার আগামী পুতুলনাচের খসড়াও তৈরি। পুতুল বানিয়ে নিতে পারলেই নাচের মহড়া শুরু করতে পারবে।

ললিতা পায়ে পায়ে এসে ঢুকেছে সেইখানে।

—বাঃ ! অবাক হয়ে ওই পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে থাকে ললিতা।

আলো-আঁধারি চালাটা। ছাউনিতে তেমন খড় নেই। ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়ছে ললিতার মুখে। ফরসা—অনেক পুরুষ্ট আব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

পুরন্দরের মনে মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে—কেমন বিচিত্র একটা উতরোল অনুভূতি।

ললিতা আসে এখানে, না এসে পারে না।

বাড়ির কথা ভাবলে তার মন বিষিয়ে ওঠে। বাড়ি তো না, একটা নরক। আর কোথাও আস্তানা-আশ্রয় নেই। দূর-সম্পর্কের কোন মাসীই তাকে ঠাঁই দিয়েছে।

বাবা-মাকে দেখেনি—কোন্ অতীতে তাদের হারিয়েছে। ওপাড়ার অনেকেরই সেই অবস্থা। ললিতা এই দুঃখ আর অপমানটা সয়েও এতদিন বেঁচেছিল। মনে মনে সব কিছুর উপরই একটা চাপা বিক্ষোভ আর নীরব প্রতিবাদ জাগে তার।

তাই এত দুষ্টু, এত মুখরা আর দজ্জালও।

প্রীতি-ভালবাসা আর মিষ্টিকথা জীবনে শুনেছে কমই।

হঠাৎ একটা জায়গায় সেই বিশ্রীভাব নেই, একটি মন তাকে নিঃশেষে ভালবাসে। এ তার জীবনের নতুন একটি আস্বাদ ; এরই জন্য যেন অধীর হয়ে থাকে সে। তাই আসে পুরন্দরের কাছে ললিতা।

ওর কাজে সাহায্য করে—ওর জন্য কিছু করতে পেরেছি ভেবে মনে আনন্দ পায় সে।

ওকে কেমন নতুন করে চিনেছে ললিতা, তাই আসে। মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুরন্দরের দিকে।

—পুরো !

কাছে এসে বসল ললিতা।

পুরন্দরের দুচোখে একটা নীরব আহ্বান।

অজানা ঝড়ে ওর বুক কাঁপছে। ললিতাকে কাছে টেনে নে

দুপুরের হলুদ রোদ কেমন রঙান স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে।

কি এক অসহ্য নবাবিষ্কৃত উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে পুরন্দর। ললিতাও দেখছে ওকে। একটা নতুন মানুষ জেগে উঠেছে ওর মধ্যে।

ললিতা অবাক হয়—কেমন ভয় লাগে তার।

—পুরো ! ফিসফিসিয়ে ওঠে ললিতা।

পুরন্দর যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, ওর নিটোল সগজাগব দেহটা নিজের কাছে টেনে নেয়। ললিতা শিউরে উঠেছে। ডাগব দুচোখে কেমন ছায়া জড়ানো।

তবু ভালো লাগে এই অনুভূতি—ওর নিবিড় স্পর্শটুকু।

গালে লাগে পুরন্দরের উষ্ণ নিশ্বাস—সব কথা তার থেমে যায় একটা তপ্ত স্পর্শে। ললিতার মনে কি একটা আবেশ সমস্ত জ্বালাকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে।

পুরন্দর যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

—পুরো !

ললিতা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

হাসছে সে। বিচিত্র কোন নারী। আজ পুরন্দরের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। পুরন্দরও কি তার এই দুর্বার চেতনার প্রকাশে চমকে উঠেছে ?

কথা বলতেও পারে না। কেমন লজ্জা আসে সারা মন ছেয়ে। ঘৃণাও আসে।

ললিতাই বলে ওঠে—আর তোমার কাছে আসবো না।

—কেন ? পুরন্দর অপরাধীর মত চাইল ওর দিকে।

ললিতা নিজেকে যেন সরিয়ে নিতে চায়।

—চুলগুলো কি করে' দিয়েছ দেখ !

ত্'চোখে ওর অপরূপ হাসির আভা, কাপড়খানা অকারণেই গায়ে জড়িয়ে বলে ওঠে—এই সব শিখছ বুঝি ?

কথা বলল না পুরন্দর। একটা পুতুলের গায়ে রং বোলাতে থাকে চুপ করে। কেমন লজ্জা লাগে তার।

কোথায় পাখী ডাকছে সবুজ গাছের আড়ালে। স্বরটা ভেসে আসে ওর মনে।

ললিতার মনে সেই খুশীর সুর।

পুরন্দরকে আজ আপন করে চিনেছে। জেনেছে।

তুজনের মাঝে একটার পর একটা বাঁধন যেন অজ্ঞাতেই তাদের মনে গড়ে উঠেছে। একটি নিবিড় সুরে তুজনের মনে তুজনের জন্য নিভৃত ঠাঁই হয়ে রইল।

* * *

—অধিকারী মাশায় গো ! অধিকারী মাশায় !

কানিকুড়ো ডাকছে পুরন্দরকে।

ভবিষ্যৎ ডাকছে অতীতকে—বহুদিনের ওপার থেকে। কেমন বিচিত্র ঠেকে ওই ডাক। ধীরে ধীরে এ জগতে ফিরে আসছে একটি সেই হারানো-দিনের মানুষ।

—অধিকারী মাশায় !

সাড়া না পেয়ে কানিকুড়ো একটু গলা তুলে হাঁকছে জোরে।

তুলোর কম্বলটা মুড়ি দিয়ে পড়েছিল পুরন্দর। জ্বর এসেছে বোধ-হয়। কেমন বিস্বাদ লাগছে মুখটা, জিবেও কোন স্বাদ নেই। কি ভাবছিল যেন আনমনে। কার কথা।

ছেলেটার ডাকে হঠাৎ চমকে ওঠে।

অনেক দূর থেকে কে যেন ডাকছে আজকের জীর্ণ পঞ্চাশ-পার-হওয়া লোকটাকে। নড়ে-চড়ে ওঠে পুরন্দর।

—কি বলছিস ?

কম্বলটা সরিয়ে মুখ তুলে চাইল পুরন্দর।

ফাঁকা মাঠ—ধুধু করছে শূন্যতায়। খেয়াল হয় কোন্ বটগাছের নীচে শুয়ে আছে সে পথের ধারে। ক্রমশঃ খেয়াল করতে পারে কি সব স্বপ্ন দেখছিল সে এতক্ষণ। ঝরাপাতার মত যারা ঝরে গেছে জীবন থেকে, তাদের মধ্যে ফিরে গিয়েছিল সে।

কোথায় কোন্ অতীতের দিনে ফিরে গিয়েছিল পুরন্দর।

একজনকে মনে পড়ে—জীবনের প্রথম স্মরণীয় সেই মুহূর্ত। আজও তাকে ভোলেনি পুরন্দর।

কানিকুড়ো বলে চলেছে—চাট্টি মুড়ি খাবা? প্যাজ আর মরিচ দিয়ে ?

—না। মাথা নাড়ে পুরন্দর

—খিদে নাই ?

কানিকুড়ো কেমন দরদভরা স্বরে কথা বলে।

বেন্দা ঢোলওয়ালাই আজ রসুইদার। আর সানাইওয়ালা যুং করে ইতিমধ্যে ছিলিম বের করে বসেছে। একমনে গাঁজার পাতাগুলো কাটছে আর বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে ডলছে। ওকে ঘিরে বসেছে দোহারকি বলরাম আর গাড়োয়ানটা। খিদেতে পেট জ্বলছে ওদের। তাগাদা দেয়।

—ভাতের কত দেরি গো ?

হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে বেন্দা বায়েন—মা লক্ষ্মী আর নারায়ণ এই তো এক হয়ে নেত্য জুড়েছেন। যুং করে টান দু'এক ছিলিম। তারপর দেখা যাবে কখন অন্ন হয়। যা দলে জুটেছিস, অন্ন এইবার পেলে হয়। ভাবছি ইবার ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে গাঁয়েই ফিরে যাবো।

তবু বিয়ে পৈতে-টৈতে হবে তো লুকের। দু'-একটা বায়না ধরবো বসে।

সানাইদার বলে ওঠে ঃ

—ধ্যাত্তেরি, ব্যাটাছেলে আবার ইকালে বিয়ে করে নাকি ! মাগনাই মাগ পেলে কেউ আবার উ ফ্যাসাদে যায় ! তাই শালা বিয়েটিয়েও হয় না যেন ধুম করে।

উবু হয়ে বসে গাঁজার কলকেটা যুৎ করে ধরে, দোহারকি বলরাম দেশলাই কাঠি জ্বালবার জন্য প্রস্তুত।

ওদের পরিবেশ থেকে একটু দূরে গাছতলায় অধিকারীর কাছে বসে আছে কানিকুড়ো। কেমন মায়া হয় পুরন্দরের জন্যে, বড় ভালো লোক। ছোঁড়া বলে ওঠে ঃ

—জ্বর এসেছে ? হ্যাঁগো ?

কানিকুড়ো ওর কাছে বসে রয়েছে। বলে ওঠে পুরন্দর—না, তুই খেয়ে লেগা যা।

কিই বা খাবে ! খাবেই বা কি ! কালকের রাত্রের চাটি মুড়ি ছিল তাই, আর পথের ধারের ক্ষেত থেকে দু'ঝাড় পেঁয়াজ তুলেছে তাই বেব করে বসে জলযোগ সারছে ছেলেটা।

চাটি মুড়ি আর রাস্তার ধারের ক্ষেতে সংগৃহীত পেঁয়াজকলি—তাই পরম তৃপ্তিভরে চিবোচ্ছে কানিকুড়ো।

কেমন ঝিমুনি আসে পুরন্দরের। কালো-সবুজ মেশা বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় সারা শরীরটা কেমন হিম হয়ে আসছে। কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নেয় সারা গায়ে। শীত শীত করছে।

কি যেন ভাবছে। হ্যাঁ।

মনটা আবার ফিরে যায় সেই অতীতের দিনে।

সেবারকার প্রথম খেলা দেখানোর ঘটনাটা মনে আসে। কেমন একটা স্বীকৃতি সে পেয়েছে, অন্ততঃ একজনের কাছ থেকে। সে ললিতা।

তারপর আরও পালা তৈরি হয়েছে। ক্রমশঃ নিজের উপর তার একটা বিশ্বাসও এসেছে।

সেই ভরসাতেই সেবার প্রথম প্রকাশ্যে পুতুলখেলা দেখায় সরস্বতী পূজোর সময় ইস্কুলের মাঠে।

অনেক ভদ্রলোক, মাস্টারমশাইরা, গ্রামের বিমল ডাক্তার, নীরোদবাবু—আরও বহু গণ্যমান্য লোক এসেছেন, ছাত্রদের ভিড়ে মাঠ ভরে গেছে। ওরা ভেবেছে যাহোক ছেলেখেলা একটা হবে, দেখাই যাক।

দুরুদুরু বুক কাঁপে পুরন্দরের।

তবু আসর করছে। চট-শালু সবই যুগিয়েছে স্কুল থেকে। নিজের মত ওকে সাজিয়ে নিয়েছে পুরন্দর।

ওদেরই একজন ছাত্রকে উৎসাহ দিতে হেডমাস্টারমশাই ত্রুটি রাখেননি। গ্রামের অনেকেই এসেছে—প্রথমে তারা ভেবেছিল একটা ছেলেখেলাই হবে আর কি, তাই হালকাভাবেই দেখছে ব্যাপারটাকে। পুরন্দর কিন্তু সে ভাবে নেয়নি। খেটেছে সে এর পিছনে।

পুরন্দর ইতিমধ্যে ন্যাড়াকে দিয়ে গান তৈরি করিয়েছে। ন্যাড়াও কয়েক বৎসরের মধ্যে যাত্রাদলে বিবেকের পার্ট পেয়েছে, সখীর পর্যায় থেকে উপরে উঠে সে এখন ধর্ম বিবেক এই সব পার্ট করে।

গলাটাও মন্দ হয়নি। সুরজ্ঞানও আছে কিছু কিছু।

পুরন্দর শুরু করেছে সিন্ধুমুনির উপাখ্যান নিয়ে পুতুলনাচ।

রামায়ণের ওই অধ্যায়টিকে তার মনোমত করে সাজিয়ে নিয়েছে। তপোবনে অসহায় সিন্ধুমুনি আর তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও প্রথমে দেখিয়েছে, আশ্রমমৃগ আর বনের প্রাণীরা স্বচ্ছন্দে আশ্রমে বিহার করছে—তপোবনের সামগানের সুর শোনা যায়। মুনি-ঋষিদের যাতায়াত—সবই যেন কেমন একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে ছায়াবাজির রাজ্যে।

দশরথ মৃগয়া করতে চলেছেন বনে।

এই একটি মদমত্ত মানুষ, যে বনের প্রাণীদেরই নয়, সেই আশ্রমের বনভূমিতে এনেছে অশান্তির, বিপদের, অমঙ্গলের কালো ছায়া। শান্ত

আশ্রমমৃগ, নীল ধেনু—সকলের মনে জাগে আতঙ্ক, ভীতত্রস্ত হয়ে তারা ছুটে পালাচ্ছে এদিক-ওদিকে। তারপরই হত্যা করেন মুনিপুত্রকে।

রাজা দশরথ শিকার করেছেন—প্রাণহরণ করেছেন ঋষিকুমারের, অপরাধী রাজা।

সকলেই বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

পুতুলগুলো—ওই প্রাণীর দলও যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নিপুণ খেলোয়াড় আর কচি দরদী মনের মাধুর্য মিশে ওই পুতুলরাজ্য সজীব হয়ে উঠেছে। ছেলে-খেলা নয়—আসল খেলাই। বেশ চিত্তাকর্ষক।

—বাঃ! চমৎকার!

প্রশংসা করেন স্বয়ং হেডমাস্টারমশাই।

বিমল ডাক্তারবাবু এখানে-ওখানে অনেক পেশাদার পুতুলনাচ দেখেছেন, তিনিও মুগ্ধকণ্ঠে স্বীকার করেনঃ এ যে একেবারে ফিনিশ্‌ড্‌ প্রোডাক্ট। ভাল পালাও বেঁধেছিস। সবই নিজে করেছিস পুরন্দর?

—হ্যাঁ স্যার! মাথা নামায় পুরন্দর।

আজ সে সারা গ্রামের লোকের মন জয় করেছে। মা-ও দেখতে এসেছিল, ছেলের প্রশংসায় তার মন ভরে ওঠে। দেখেছে মেয়েদের চোখে জল এসেছিল সিন্ধুমুনির ওই জায়গাটায়।

পুতুলও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

—এসব কোথায় শিখল গো? ও পুরোর মা—

পুরন্দরের মা বলে—কে জানে বাছা! পড়াশোনা করে—পালাগানও বেঁধেছে; আর পুতুল-টুতুল তৈরি করে বটে, করতোও। কে জানে এসব কি ওর মাথায় ছিল।

মেয়েরা প্রবীণার দল আশীর্বাদ করে।

—আহা, বেঁচে থাক বাছা!

খুশীমনে বাড়ি ফিরেই পুরোর মা দেখে পুরোর বাবা গুম হয়ে দাওয়ায় বসে আছে।

হ্যারিকেনের শিষটা কমানো, মিটিমিটি জ্বলছে। একটু আবছা আলোয় ওর মুখের দিকে চেয়ে বিশেষ কিছু টের পায় না। গলার স্বরে বুঝতে পারে ফকীর বেশ চটে উঠেছে। ছেলের এইসব কাণ্ড সে মোটেই সমর্থন করে না।

ফকীর গর্জে ওঠে—খুব তো নাচ দেখানো হল, বলি, এ সব হচ্ছে কি ?

ফকীরের চোখ দুটো করমচার মত লাল হয়ে উঠেছে।

নেত্য বলে ওঠে—সারা গাঁয়ের মাথা সিখানে হাজির। সববাই কত কি বললে। যা পুতুলনাচ দেখালো পুরো—

খিঁচিয়ে ওঠে ফকীর—তবে আর কি! পেট ভরে গেল আমার! বলি, পয়সা-টাকা পেয়েছে কিছু ?

—টাকা! একটু অবাক হয় নেত্য।

গলা চড়িয়ে জবাব দেয় ফকীর। দুটো আঙুল পরস্পর ঠেকিয়ে একটা ইশারা করে জানায়।

—হ্যাঁ, ট্যাকা। বলি, সেই বস্তু কিছু আসবে ওতে ? কাঁচকলা আসবে !

চুপ করে গেল নেত্য স্বামীর কথায়। নিজেও দেখেছে দিনরাত পরিশ্রম করে ফকীর কি পায় ; অনেক আশা নিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে আছে সে।

সেই পুরন্দর পাস করবে। মানুষ হবে। চাকরি পাবে বাবুদের মত। তার দিন বদলাবে।

কিন্তু এসব নেশার ফল কি তা দেখেছে ফকীর, পিছল পথ, এ পথে যে যায়, সে আর ফেরে না।

তাই শিউরে উঠেছে।

নেত্য কথা বদলাবার জন্য বলে ওঠে ঃ

—খাবা না ? রাত ঢের হয়েছে।

—না। আসুক সে।

নেত্য একটু ভয় পায় আজ ওকে দেখে।

অর্থাৎ, ফকীর গুম হয়ে বসে থাকবে, ছেলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া সে করবেই আজ।

স্বামীর এই ব্যবহার নেত্যর কেমন ভালো লাগে না।

এত দিন এত বৎসর পরিশ্রম করে শুধু চেয়ার-বেঞ্চি-টেবিলই বানালো লোকটা। কই, সারা গাঁয়ের ওই মানী-গুণী লোকেরা কেউ তাকে জড়িয়ে ধরে না। পোঁছে না।

আর পুরন্দর! কত লোকের মনে হাসি-কান্নার সুর তুলেছে।

সে নিজের চোখে দেখেছে আজ ওর কত ভাগ্য।

মা হয়ে ছেলের এই জয়ে আজ আনন্দ পেয়েছে সে। ফকীর এতদিনে যা তাকে দিতে পারেনি, পুরন্দর তাই দিয়েছে। জয়ের গৌরব। এ কথা ফকীরকে সে বোঝাবে কেমন করে।

রাত হয়ে আসছে। পাড়ার এখানে-ওখানেও ছোটখাটো সরস্বতী পূজো হয়েছে। ছেলের দল এই শীতেও জেগে আছে সেখানে। অনেকেরই মুখে পুরোর পুতুলনাচের গল্প।

অবিনাশ অধিকারী এই কয়েক মাস আগেই পুতুলনাচ দেখিয়ে গেছে বাজারপাড়ায়। নামকরা দল—অনেক আয়োজন, মালপত্র ছিল তার দলে। কিন্তু পুরোর গান এবং পুতুলনাচ তার চেয়ে কম জমাট নয়।

পুরন্দর ফিরছে বাড়ির দিকে।

পুতুলের বাক্স মাথায় রয়েছে রামপদর, ন্যাড়ার মনে ভারী খুশির আভা। গানও ভাল হয়েছে, জমাটি গান।

ভরপেট খাইয়েছে আজ মাস্টারমশাইরা। লুচি, বাঁধাকপির তরকারি, ডাল আর বোঁদে।

তাছাড়া গাঁয়ের হোমরা-চোমরা অনেকেই উপস্থিত ছিল, তারিফ করেছে তাদের পুতুলনাচের। হেডমাস্টারমশাই নিজে এসে সাজঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখেছেন তাদের পুতুলনাচের কায়দাটা।

একটার পর একটা পুতুল কেমন সারিবন্দী নেচে চলেছে, একটো করছে পালাবন্দী।

প্রশংসা করেন তিনি—বাঃ, বেশ করেছিস তো!

ন্যাড়া যাত্রার দলে এ খাতির পায় না। বামপদও পুতুলের দড়ি টেনেছে আজ।

ন্যাড়া বলে ওঠে—দেখ, এবার বায়না না নিয়ে গাওনা করবি না।

যাত্রার দলে থেকে ন্যাড়া ব্যবসা কিছু বুঝেছে।

—পয়সা নিয়ে পুতুলনাচ দেখাবো?

পুরন্দর একটু অবাক হয়।

ন্যাড়া বলে:

—কেন নিবি না? দল কি আমাদের কিছু নিবেস নাকি, এ্যা? অবিনাশ অধিকারী কি একাই বিধাতাপুরুষ?

কি ভাবছে পুরন্দর।

অবিনাশ অধিকারীর কথা ভোলেনি পুরন্দর।

অনেকদিন আগেকার কথা। বড় আশা নিয়ে সেদিনের একটি কিশোর গিয়েছিল তার কাছে পুতুলনাচ শিখতে। শেখায় নি সে; এ জিনিস শেখাতে চায়নি।

অবিনাশ উলটে তাকেই পুতুল বানাবার হুকুম দিয়েছিল।

কোন রকমে দৌড়ে পালিয়ে এসে বেঁচেছিল পুরন্দর।

সে-কথা ভোলেনি আজও পুরন্দর।

সেই অপমানটা বেজেছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বোধহয় সারা মন দিয়ে তার জাতবিদ্যাকে এই পথে নিয়োগ করে সে কিছু শিখে নিয়েছে।

তবু অবিনাশ অধিকারী এদিকের সবচেয়ে বড় পুতুল-নাচিয়ে, তার পুতুলও যেমন সুন্দর, পালাগানও তেমনি চমৎকার। এখনও এ-রাজ্যের সেই-ই সম্রাট।

বলে ওঠে—না রে, অবিনাশ অধিকারী মস্ত লোক।

ন্যাড়া ভুঁইফোড়। সে বলে ওঠে ঃ

—থাক্ থাক্। মোট কথা, ইবার বায়না ছাড়া কথা লয়। আর যি টাকা আসবে, নোতুন পুতুল গড়বি, পালা বাঁধবি মুরারীমাস্টারকে দিয়ে। খরচ তো আছে। পয়সা না নিলে দল চালাবি কি করে?

কি ভাবছে পুরন্দর, কথাটা খারাপ বলেনি ন্যাড়া।

বাড়ির কাছে এসে ওরা চলে গেল ওদিকে। রামপদর বাড়িতেই ওসব মালপত্র থাকে। পুরন্দর বাবার জন্য ওসব নিজের ঘরে রাখতে পারে না।

আবছা অন্ধকার।

শীত লাগে। গুঁড়িগুঁড়ি কুয়াশা আর শীতের ধোঁয়া গাছের মাথায় একটা ফিকে আস্তরণ রচনা করেছে।

হঠাৎ নির্জন পথে কাকে দেখে দাঁড়াল পুরন্দর।

একটা ছায়ামূর্তি তাকে দেখে আঁধারেই এইদিকে এগিয়ে আসছে।

আকাশ ঘিরে আবছা অন্ধকার নেমেছে, তারাজ্বলা অন্ধকার।

এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তিটা। কাছে আসতে চিনতে পারে পুরন্দর একটু অবাক হয়।

—তুই এত রাতে?

ললিতা।

এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়াল। সে-ও দেখতে গিয়েছিল পুতুলনাচ। এর আগে ওই পালার কথা অনেক শুনেছিল পুরন্দরের মুখে, পুতুল তৈরি করেছে, রং করেছে ললিতাও।

আজ সেই সব তোর পুতুল আর গান মিলিয়ে পুরন্দর একটি স্নুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছি।

ললিতার দু'চোখে ফুটে উঠেছে আনন্দ আর অফুরান তৃপ্তির আভা। তার পুরন্দর আজ সারা গ্রাম জয় করেছে।

পুরন্দর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে—গিইছিলি? কেমন লাগলো?

ললিতা ওকে আবছা অন্ধকারে সহসা দুহাত দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। অবাক হয় পুরন্দর।

—কিরে ?

ললিতা হাসছে, মিষ্টি একটি সুরেলা হাসি।

—খুব ভাল লাগলো ওই পুতুলনাচ। একেবারে যেন জ্যান্ত সব।

তারই প্রকাশ ওর ওই হাসিতে, নিবিড়করা এতটুকু উষ্ণ স্পর্শে।

পুরন্দর হঠাৎ ওর খুশির আতিশয্যে একটু চমকে উঠেছে।

রাতের আঁধারেই আবার মিলিয়ে গেল মেয়েটা।

—ললিতা !

পুরন্দর যেন জেগে উঠেছে।

আজকের দুর্বার আনন্দের মাঝে সেই আগেকার আদিম তৃষ্ণা ওর কণ্ঠতালু শুষ্ক করে তোলে। কিন্তু রাতের আঁধারে অধরা নারী রহস্যময়ীই রয়ে গেল।

তাকে আর দেখা যায় না।

পুরন্দরের সারা দেহ-মন নীরব একটা উত্তেজনায় ভরে ওঠে।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে। বাড়ির বাইরে পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী মূর্তিটা, দু'চোখে তার অসহ্য একটা জ্বালা।

ও পথ দিয়ে সে যেতে দেখেছে ললিতাকে, শুনেছে ওর হাসির মিষ্টি শব্দ। আবছা অন্ধকারে সে দেখেছে পুরন্দরের মনের ওই ঝড়।

কোন কিছুই ওর নজর এড়ায়নি। ফকীর ফিরছিল, পথে ওদের দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে-ও দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ওরা খেয়ালই করেনি।

নিজেদের চিন্তাতেই বিভোর ছিল।

পুরন্দর এতক্ষণে যেন ওকে দেখতে পায়।

এগিয়ে আসে ফকীর।

সে ওদের কথার শব্দে বের হয়ে এসেছিল।

নিশুতি হিমঢাকা রাত। ওদের কথার ফিসফিসানি শব্দও ওর কানে গেছে। শুনেছে ওই বেহায়া মেয়েটার হাসির শব্দ।

জানে ওই ললিতাকেঁ। ওদের পরিচয়।

বানে-ভাষা খড়কুটোর মত এসে এক ঘাটে ঠেকেছে ওই মেয়েটা। চালচলনও বেবশ।

ওর পরিচয়ও অন্ধকার রহস্যে ঢাকা।

সেই বেজাত মেয়েটার সঙ্গে পুরন্দরের ঘনিষ্ঠতা ও দেখেছে।

আগুনে ঘি পড়ার মত জ্বলছে ফকার।

এগিয়ে এসে পুরন্দরের চুলের মুঠিটাই খপ্ করে ধরে। তারপরে দিগ বিদিক জ্ঞান হারিয়ে শক্ত হাতে কিল-চড়-লাথি মারতে থাকে। অতর্কিত আঘাতে ছিটকে পড়ে পুরন্দর। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে পুরন্দর

তখনও ফকার লাথি মেরে চলেছে, পিঠে গায়ে সমানে। গর্জন করে।

নচ্ছার হারামজাদা কোথাকার!

নেত্যও শুনেছে ওই ঝটাপটি আর্তনাদের শব্দ। ফকার চাপা স্বরে গর্জন করে চলেছে।

—খুন করে ফেলবো আজ ছাপ। এত বাড় তোর!

কোন কথা বলে না পুরন্দর। মার ঠেকাবার চেষ্টাও করে না যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

নেত্য হ্যারিকেন হাতে ছুটে এসে কাণ্ডটা দেখে ফকারের সামনে দাঁড়াল। কেমন চাপা রাগে গোঁ গোঁ করছে ফকার। মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছে।

পুরন্দর রাস্তার হিমভেজা ঘাসের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে। নাক দিয়ে, ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। জামাটা ছেঁড়া—ছিটকে পড়েছে গায়ের চাদর।

নেত্য বলে ওঠে

—রাতদুপুরে কি খুনখারাপী করবা ? এ্যাঁ ! কি হয়েছে ?

পুরন্দর কোন কথা বলে না।

ফকীর তখনও হাঁপাচ্ছে, তবু গর্জন করে—হ্যাঁ, তাইই করবো।

নেত্য বাধা দেয়—সরে যাও বলছি।

স্বামীকে কোনরকমে টেনে সরিয়ে দিয়ে পুরন্দরকে তুললো সে।

জলধর কোনরকমে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

নাক-ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে পুরন্দরের।

তখনও চুপ করে আছে সে।

—কি হয়েছে ?

—কিছু না। পুরন্দর বলে ওঠে।

বুঝতে পারে না, কি এমন অন্যায় করেছে সে, যার জন্য বলা-কওয়া নেই, আধমরা চোরের মত মারবে তাকে ওই লোকটা।

ললিতা কোন দোষ করেনি।

এইবার ক্রমশঃ বুঝতে পারে ব্যাপারটা। মনে মনে একটা চাপা অভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে পুরন্দরের।

এত বড় হয়েছে, কি সে পেয়েছে বাবার কাছ থেকে ?

বৃত্তি পেয়েছে, তাইতে পড়েছে, বই কিনেছে। নিজের রোজগারও হয় টুকিটাকি কাজ করে, তাই দিয়ে জামা-কাপড়ও করে। নিজের সব খরচই নিজে জোটায়।

দেখেছে বাবার শুধু ওই একটি মূর্তি। শাসন করার ব্যাপারেই দড়। অভাব আর অনটনের জ্বালায় শুধু জ্বলছে। পয়সা যা পায়, তা দিয়ে ও কি করে জানে পুরন্দর।

বলেনি।

মধু শুঁড়ির দোকানের আশেপাশে প্রায়ই দেখেছে বাবাকে। পুরন্দর বাবাকে পথে দেখতে পেলে সরে যায় নিজে।

আরও কাদের সঙ্গে দল বেঁধে বিশ্রী হৈ-হল্লা করে ফকীর। বাধ্য হয়েই ওই পথ দিয়ে হাঁটা ছেড়েছে পুরন্দর।

বাবাকে পরিশ্রম করা থেকে পুরন্দর কেন ছুটি দিতে পারছে না, আর ওই রসদটা কেন যোগাতে পারছে না—এইটে ফকীরের বহুদিনের ক্ষোভ।

নেত্য ডাকছে।

—চল্, ঘরে চল্ পুরো!

মায়ের দিকে চাইল পুরন্দর। দু'চোখে ওর প্রতিবাদের কাঠিন্য। বাবার উপর পুঞ্জীভূত রাগ আর অভিমান আজ প্রকাশ পায় ওর নীরব কঠিন চাহনিতে।

নেত্য তা জানে।

নেত্য বলে ওঠে—রাগের ঘোরে এসব করে ফেলেছে। চল্।

পুরন্দর মাকে দুঃখ দিতে চায় না। তাই চুপ করেই বাড়ি ঢুকল।

কেমন যেন নতুন একটি কঠিন মন তার মাঝে আজ প্রতিবাদের দৃঢ়তা নিয়ে জেগে উঠেছে। তার নবযৌবন নতুন প্রাণসত্তা আজ নিবিড় আঁধারে পথ খোঁজে—মুক্তির পথ।

ফকীর ছেলের দিকে চেয়ে আছে।

সে-ও ওই নীরব কঠিন চাহনির দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। তার চোখেও ওই কাঠিন্য, ওই অন্তরের আগুন নেই।

কথা বলে না পুরন্দর। চুপ করে তার কুঠুরিতে ঢুকে বিছানাটা পাড়তে থাকে।

মা বলে—খাবি না? হাত-মুখ ধুয়ে নে।

মায়ের কথায় পুরন্দর কোন রকমে জবাব দেয়ঃ

—খেয়ে এসেছি ইস্কুলে, খিদে নাই।

এই রাতের সেই অমানুষিক প্রহারের কথা ভোলেনি পুরন্দর। ভোলা যায় না।

চুপচাপ থাকে।

ফকীরও একটু অবাক হয়েছে।

পুরন্দর বাবার সামনে বের হতে চায় না। কেমন বিরক্তি এসেছে তার মনে।

ললিতা ক'দিন থেকেই দেখছে তাদের বাড়ির আবহাওয়া কেমন বিষিয়ে উঠেছে। আগে থেকেই এগুলো ছিল, তখন ঠিক বোঝেনি। এখন বুঝতে পারে।

গ্রামের বাইরে তাদের পাড়া—কোন দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মা কাউকে দেখেনি। মনেও পড়ে না।

মাসীমার এখানেই রয়েছে। কেমন দূর-সম্পর্কের মাসীমা। দয়া করে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ক্রমশঃ বুঝতে পারে এ দয়ার দাম তাকে দিতে হবে কি ভাবে।

আরও আশপাশের বাড়িতে দেখেছে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে এ গ্রামের অনেক লোকই আসে।

হাসি-মস্করা হয়, বাতাসে ওঠে মাংস-রান্নার তাজা মিষ্টি সৌরভ। মধু শুঁড়ির দোকানেব লোকও মালপত্র বোতলগুলো আনে কাগজে জড়িয়ে। দাম নিয়ে আবার অন্ধকারেই চলে যায়। এদের হল্লা চেঁচামেচি বাড়ে।

ও বাড়ির কাদু রোজ সন্ধ্যার আগেই সাজবেশ করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। গান তার আসে না, তবু বসে।

ললিতা একদিন এমনিই শুধিয়েছিল—এত সাজ কেন গো রোজ রোজ!

হাসে কাদু। একটু চোখ ঘুরিয়ে বলে:

—বয়স হোক, তুইও সাজবি। আর, তোর যা রূপ—দেখিস যেন আমাদের কথা ভুলেই যাসনে।

—ধ্যাৎ!

ললিতা মুখ-চোখ ঘুরিয়ে কার বাগান থেকে সংগৃহীত কাঁচা পেয়ারায় কামড় দিতে থাকে নিবিষ্ট মনে।

দস্যি ডানপিটে মেয়ে। দু'চোখ মেলে এ পাড়ার যাত্রীদের দেখে। বুড়ো হয়ে গেছে নস্তুবাবু, তবু গায়ে তার আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে জুতো। কোঁচাটি হাতে পদ্মফুলের মত বাহার করে ধরে ছড়ি নিয়ে আসে রোজই কাদুদির ঘরে। ওই নস্তুবাবুকে এক ধাক্কা মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয় ললিতার।

ওই নস্তুবাবু সেদিন সন্ধ্যায় ওকে দু'আনা পয়সা দিয়েছিল।

অবাক হয় ললিতা।

—পয়সা!

হাসে নস্তুবাবু, দাঁত-পড়া মুখে সেই হাসি দেখে গা জ্বালা করে ললিতার।

—পান খাবি, মানাবে ভালো। বুঝলি!

ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দেয়।

চটে ওঠে ললিতা।

—এই লাও তোমার পয়সা!

—কেন রে? এ্যা?

—তুমি লোক ভালো লও।

হাসছে নস্তুবাবু, বাঁধানো দাঁতে হাসতে গেলেও খটখট করে একটা শব্দ হয়। সরে গেল ললিতা।

আরও অনেকে আসে। সবাই যেন এখানে আসে জানোয়ারের মত। রাতের আঁধারে তারা কত যেন আপন জন, দিনের আলোয় ওই নস্তুবাবু, বড় তরফের বাঙাবাবু—সবাই কেমন অন্য মানুষ। কাছারিবাড়িতে গেছে দু-একবার মাসীর সঙ্গে বাস্তুজমির খাজনা দিতে। সেখানে ওরা অন্য মানুষ, যেন চেনেই না।

দাঁড়িয়ে আছে, তা বাবুদের খেয়াল নেই। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে।

—ও বাবু! ঢের দেরি হয়ে গেল যে!

ললিতাই বলে ওঠে অধৈর্য হয়ে।

রাঙাবাবু ধমকে ওঠে :

—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। পাঁচ আনার জমাবন্দীতে অমন দেরই হবে। গোমস্তা মশায়, হরিশ্চন্দ্রপুরের রোকড় আনো।

আবার অন্য কাজে মন দেয় রাঙাবাবু।

এ যেন অন্য জগতের জীব। ললিতার শিশুমনেই কেমন তাদের প্রতি ওদের একটা অবজ্ঞা আর অবহেলার অস্তিত্ব খুঁজে পায় সে। নিজেদেরই বিশ্রী ঠেকে ওদের ওই চাহনি।

মুখ বুজে বসে থাকে বাইরের দালানে।

অনেকেই যেন তাদের দেখে আড়ালে হাসাহাসি করে।

এখানে আসাটা তাদের বেমানান।

ওই রাঙাবাবুর দলও যায় রাতের অন্ধকারে তাদের পাড়ায়। কাদুর বাড়িতেই দেখেছে রাঙাবাবুকে। কড়িবাঁধা আলাদা হুঁকো আছে, ঢালা ফরাশে বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান খায় আর হাসি-মস্করা করে।

হঠাৎ আবিষ্কার করেছে ললিতা, কিছুদিন থেকে তার যেন একটু দাম বেড়ে গেছে এবং কেন সেটাও বুঝতে দেরি হয় না।

ওই রাঙাবাবুই সেদিন ওর দিকে চেয়ে থাকে। বয়স হয়ে গেছে লোকটার, মাথায় একটা আকাশজোড়া টাক। তবু এখনও বেশ কঠিন পেটা গড়ন। চোখদুটো সন্ধ্যার পর দ্রব্যগুণে লালই থাকে।

ক'দিন থেকে রাঙাবাবু তাদের বাড়িতেও আসছে। মাসীর সঙ্গে খাতির আছে। মাসীও ওই বুড়োবাবু এলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে। ললিতার হাত দিয়ে পান-তামাক পাঠায়।

ললিতার এসব ভাল লাগে না। সেইদিন কাছারীতে লোকটা কেমন ধমকে কথা বলেছিল।

হুতুমপ্যাঁচার মত মুখখানা।

কি এত কথা বলে শোনে না সে। তবে ললিতা দেখেছে, তার জন্যে আনছে নতুন শাড়ি, দু'-একখানা গয়না।

মাসী তাকে আর বকাঝকাও করে না।

বলে—দিনরাত কোথায় যে টো টো করে ঘুরিস, হ্যাঁ রে ?

ললিতা জবাব দেয়—আমার খুশি যাবো !

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়েই কেমন অবাক হয় ললিতা। এ যেন অন্য কোন জন।

সারা দেহে এসেছে একটা পরিবর্তন। ভাদ্রের ময়ূরাক্ষীর মত সারা দেহে এসেছে পূর্ণতার সাড়া। মেঘঢাকা আকাশের মত সারা পিঠ জুড়ে তার কালো চুল নামে।

নিজেকে কেমন অসহায় একা বোধ করে।

মনে পড়ে পুরন্দরকে। সেদিন তাই চমকে উঠেছিল।

তার সারা দেহ-মনের এই ঝড়ের খবর সে জানে। তাই 'তাকে ঘিরে রেখেছে একটি নিরাপদ মাধুর্যভরা স্নিগ্ধতায়।

কেমন ভালো লাগে।

সেই স্পর্শটুকু মনে আজও কেমন তৃপ্তি আনে ললিতার মনে।

সেই পুতুলনাচের আসর থেকে আজ পুরন্দরের সঙ্গে একলা দেখা করেছিল তাই।

কেমন রাতের তারাজ্বলা আকাশের মত একটা কামনার সদ্যজাগর জ্বালা তার সারা দেহে-মনে।

তাই নিবিড় করেই পেতে চেয়েছিল তাকে নিভৃতে।

কিন্তু হঠাৎ কার ছায়ামূর্তি দেখে সরে আসে।

পালাতে পারেনি, একটু দূরেই একটা গাছের নীচে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল ললিতা।

ওর বাবাকে চেনে ললিতা।

এ পাড়াতে বাসন্তীর ঘরে ফকীর আসে মাঝে মাঝে।

এ গ্রামের অনেককেই জানে ললিতা। তাদের বাইরে থেকে চেনবার উপায় নেই, অথচ এ পাড়ার নরকের কীট তারা। তাই ওদের আসল পরিচয় ললিতা জানে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে।

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে কুয়াশাঢাকা আকাশটা দেখা যায় ঘষা কাঁচের মত অস্বচ্ছ।

শীতে কাঁপছে, তবু সরে যেতে পারে না।

কেমন যেন ভয় লাগে ওর।

লোকটার মতিগতি ভালো নয়।

হঠাৎ তারার আলোয় দেখে পুরন্দরের উপর একটা হিংস্র জানোয়ারের মত লাফ দিয়ে পড়েছে ওর বাবা। মারছে ওকে।

ললিতা প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয়, চিৎকার করতে যাচ্ছিল।

দু'হাতে মুখ টিপে ধরে সে দেখছে ওই করুণ দৃশ্যটা।

পুরন্দর মাটিতে পড়ে গেছে, তবু ছাড়েনি। লোকটা ওকে মেরে চলেছে নির্দয়ভাবে। কুকুরকেও মানুষ এমনিভাবে মারে না।

অস্ফুট আর্তনাদ করছে পুরন্দর।

ওই প্রত্যেকটি আঘাত যেন ললিতার বুকেই বাজে।

ললিতা অনুভব করে সে কাঁদছে। দু'চোখে তার জল নেমেছে; অসহায় কান্না কাঁদছে সে-ও।

বুকের ভিতর কেমন একটা নীরব অসহ্য বেদনা জাগে।

আলোটা নিয়ে পুরোর মাকে বের হয়ে আসতে দেখে গাছের আড়াল থেকে সরে রাস্তার দিকে চলে গেল ললিতা। কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়।

পালাচ্ছে।

কাঁদছে আর পালাচ্ছে ভীরু একটি মেয়ে।

নিশুতি পথ। শীতের ধমকে সবাই যেন ভয়ে চুপ করে গেছে। দিঘির জলে কোন্‌দিকে মিলিয়ে গেছে সব পদ্মগাছগুলো। ফাঁকা ওর প্রশস্ত বুক। শূন্য।

শুধু কুয়াশার হাল্কা একটা চাদর আসমান থেকে নেমে এসেছে ওদের উপর। ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ললিতা চুপ করে। মনে একটা জমাট দুঃখের ছায়া।

কঠিন দস্যি মেয়েটা আজ কাঁদছে পুরন্দরের লাঞ্ছনায়। জীবনে তার মানুষের উপর ঘৃণা আসে—পুঞ্জীভূত দুঃসহ ঘৃণা। ফকীরের গোল গোল চোখদুটো জ্বলে ওঠে কি নৃশংস পাশবিকতায়! কালো ছায়াটা হিংসায় উন্মাদ হয়ে পুরন্দরের উপর লাফিয়ে পড়েছে।

পালিয়ে এসেছে ললিতা, দেখে পালিয়ে এসেছে চোরের মত। কোন কথা বলতে পারেনি। বাধা দিতে সাহস হয়নি।

নিশুতি পাড়া। উৎসবের আলো দু-একটা ঘরে তখনও জ্বলছে। শোনা যায় কাদের হাসির টুকরো শব্দ। ললিতার এসব ভাল লাগে না।

বাসিনীর গানের সুর ভেসে ওঠে। বেসুরো গলায় মেয়েটা চিৎকার করছে। রাতের আঁধারে ওর কর্কশ স্বর বিশ্রী লাগে।

ললিতার মন বিষিয়ে উঠেছে।

বাসিনী, কানু, আরও সবাই—এপাড়ার বাসিন্দারা যেন অন্য জগতের জীব।

মদ খেয়ে বাসিনী প্রায়ই এমন চেঁচায়।

বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ললিতা।

দরজাটা ভেজানো। ঠেলতেই খুলে যায়। দাওয়ায় হ্যারিকেন একটা মিটিমিটি জ্বলছে। একটা ধোকড় কম্বল জড়িয়ে মাসী ঝিমুচ্ছিল, ওকে দেখে উঠে দাঁড়ায়।

ঘুম ছুটে যায় তখনিই।

বেশ গলা তুলে বলে ওঠে :

—কোথা ছিলি রাত দুপুর অবধি ?

ললিতা জবাব দেয় :

—পুতুলনাচ দেখতে গেইছিলাম।

মাসী মুখবিকৃত করে বলে ঃ

—তা আর যাবি না আজ! শেয়ালের মলে কাজ হলে শেয়াল পরবতে গিয়ে হাগে। বেছে বেছে তাই আজই গেলি নাচ দেখতে!

কথা কইল না ললিতা। মনমেজাজ ভালো নেই। তখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই কালো নৃশংস মূর্তিটা। মেরে চলেছে পুরন্দরকে উন্মাদের মত।

মাসী বলে চলেছে—আমি তো ভেবে সারা! মেয়ে গেল কোথায়! কি গেরো বল্ দিকি!

ললিতা ফোঁস করে ওঠে—ভয় নাই, মরব না।

—বালাই! ষাট! তোর শত্তুর মরুক!

বুড়ীর দাঁতপড়া তোবড়া মুখে আবছা আলো পড়ে কেমন বিশ্রী ডাইনীর মত দেখাচ্ছে। ওর মুখে ওই সব মিষ্টি কথা শুনে অবাক হয়েছে ললিতা।

কাপড়খানা ছাড়তে যাবে, বাধা দেয় মাসী—আহা, পরেই থাক না! কেমন সোন্দর দেখাচ্ছে তোকে। তা, রূপ পেয়েছিস বটে। দেখাবার মত।

ললিতার ওসব কথা ভালো লাগে না। কাতুর বিশ্রী ইঙ্গিতপূর্ণ হাসির মতই ওই কথাগুলো বিশ্রী ঠেকে।

রাত আঁধার হয়ে আসে। নিঝঝুম নিশুতি রাত।

ঘরের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢোকে। বাইরে শীত লাগছে। মাসী তখনও হ্যারিকেন নিয়ে বাইরে কি করছে। ঠিক ঠাওর করতে পারে না ললিতা। ওর কাজ যেন ফুরোয় না।

আবছা অন্ধকারে বিশাল একটা ছায়ামূর্তি নিমেষের মধ্যে ঘরের একদিক থেকে এগিয়ে এসে তার মুখটা চেপে ধরে। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পাবে না, কার দুটো চোখ নীলাভ দীপ্তিতে জ্বলছে। কঠিন নির্মম আক্রমণ। কোন দস্যু যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আর্তনাদ করতে গেল ললিতা।

যেমন করে হোক ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবে নিজেকে।

আবছা আলোয় লোকটার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে।

এই কাণ্ড ঘটবে স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

বিস্ময় ও ঘৃণায় শিউরে উঠেছে ললিতা।

মুখ দিয়ে সাড়া বের হয় না। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

চোখের সামনে ফুটে ওঠে রাঙাবাবুর কঠিন লুব্ধ চাহনি—ওর জ্বালাধরানো নিশ্বাস আর ওই শ্বাসরোধকারী প্রবল একটা মূর্তি তাকে যেন নিঃশেষে পিষে ফেলবে।

কাঁদছে!···কাঁদছে ব্যর্থ অসহায় নারী।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফকীরের কালো ছায়াটা পুরন্দরের উপর লাফ দিয়ে পড়েছে। রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েছে পুরন্দর অতর্কিত আক্রমণে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে পুরন্দর, মুখ দিয়ে বের হয় অস্ফুট আর্তনাদ।

সব আবছা অচল অন্ধকার। কান্নাও যেন ফুরিয়ে গেছে ওই নির্মম অপমানে।

ওরা সবাই দৈত্য—জানোয়ারের দল। এখানের সবাই জানোয়ার।

নতুন করে সেই নিষ্ঠুর জানোয়ারদের চিনেছে ললিতা তার সর্বস্বের বদলে।

অন্ধকারে নিষ্ঠুর দৈত্যটা বের হয়ে যায়।

কাঁদছে ললিতা—দুঃখে আর অপমানে।

রাত কত জানে না।

মনে হয় এই রাতেই বের হয়ে যাবে এ-বাড়ি থেকে। পালিয়ে যাবে। বেশ বুঝেছে ললিতা তার গতি কি হবে। আজ বুড়ী তার ষোল আনা পাওনা উশুল করে নিতে চায়।

এ পাড়ার এই রীতি। এ জগতের এই কানুন।

কান্থ—বাসিনী—নির্মলা—এবং আরও অনেকেরই মতই পচে মরতে হবে তাকে এই নরকে। তার চেয়ে এই অন্ধকারেই বের হয়ে যাবে সে। পালাবে এই নরক থেকে।

কিন্তু যাবে কোথায়?

ভাবছে ললিতা।

এত বড় পৃথিবীর পথ সে চেনে না।

আঁধারে হারিয়ে যাওয়া বন্দী একটি জীবের মত ঘেংড়ে ঘেংড়ে কাঁদছে।

রাতের তারাগুলোও হারিয়ে গেছে কোন্ অতলে।

হিমেল বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না ললিতা। ঘুম ভেঙে যেতে দেখে দিনের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে ছেঁড়া বিছানার উপর।

উঠে বসল ললিতা।

সকালের আলো—ওই মিষ্টি হলুদ রোদ কেমন নেশা আনে। রাতের সেই আতঙ্কটা একটা দুঃস্বপ্নের মত সারা মনের এক চিলতে আনন্দকে মুছে দেয় একটা কালো ছায়ায়।

পাখীর সুর, আকাশের সোনা রোদ সব বিশ্রী ঠেকে তার কাছে

কান্না আসে ললিতার। পুরন্দরের কথা মনে পড়ে, তাকেও তারা বাদ দেয়নি। চরম আঘাত হেনেছে।

মনে পড়ে কালকের রাতের সেই ঘটনাটা।

মনের সব আলো কালোয় ঢেকে যায়।

ধীরে ধীরে উঠে এল বিছানা ছেড়ে ললিতা

কি ভাবছে। আকাশ-পাতাল সে ভাবনার শেষ নেই।

কোথায় যেন যাবে সে। এখান থেকে অনেক দূরে।

যেখানে হোক পালাবে। দুঃসহ হয়ে উঠেছে এখানের নিদারুণ এই যন্ত্রণার জীবন।

মাসী বসেছিল, বলে ওঠে—কোথা যেচিস, এ্যা?

মাসী কেমন যেন পাহারাদারের মত তাকে চোখে চোখে রেখেছে। ওকে উঠে আসতে দেখে চাপা রাগ জেগে ওঠে।

রাগে ঘৃণায় দপ্ করে জ্বলে ওঠে ললিতা—যমের বাড়ি।

হাসছে বুড়ী। লালচে মাড়িটা বের হয়ে পড়ে। কথাটা শুনে নিশ্চিন্তই হয় সে। তবু ভাল যে, বলেছে কথাটা।

মুখে একথা যারা বলে, তাদের কেউ যে ওই দিকে যায় না, তা ও ভালো করেই জানে। তাই নিশ্চিন্তই হয় মাসী।

বের হয়ে গেল ললিতা।

মনে মনে তখনও হাসে বুড়ী।

জানে কোথায় যাবে সে। বয়সকালে এমন রং ধরে অনেকেরই। মনে হয়, এই একেবারে পাকা জাফরানী রং। কিন্তু দু'এক ধোপ পড়তে দেরি। সব রং জ্বলে বাখ্ছাট্কা হয়ে যায়। নতুন করে মানুষ খোঁজে। মনের মানুষ।

তাই ললিতাকে এখানে ওখানে যেতে বাধা দেয়নি বুড়া। বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত তাকে মাঝে মাঝে খেলতে দিয়েছে। জানে দরকারমত সে টেনে তুলবেই।

রাগে দুঃখে অপমানে আজ ললিতা মরিয়া হয়ে উঠেছে। জানে, একটা ঠাঁই তার আছে, যেখানে সে সান্ত্বনা পাবে, পাবে এতটুকু নির্ভর।

প্রথম যৌবনের সেই নেশা-আনা মন আজ চরম বিপদে নির্ভরের আশা করেই এগিয়ে চলেছে সকালের আলোমাখা পথ দিয়ে। ছায়াঘন পাখীডাকা সেই পথ।

রাতে ঘুমোতে পারেনি পুরন্দর।

দেহের আঘাতের চেয়ে আঘাতটা বেজেছে আরও অনেক বেশী তার মনে। তার এতদিনের ধারণা—সব সহ্যসীমা অতিক্রম করে গেছে।

অনেক দেখেছে পুরন্দর। অনেক সয়েছে এতদিন।

বাবা মাঝে মাঝে রাত্রে ঘরে ফেরে চুরচুরে মাতাল হয়ে। মদের নেশায় সব খুইয়েছে সংসারের। মায়ের কোন কথা বলবার উপায় নেই। ওর গায়েই হাত তুলবে, তোলেও। মা চুপ করে সয়ে যায়। চাল কেনবার পয়সা পর্যন্ত থাকে না। এখান ওখান থেকে সব ছাইপাঁশ গিলে ফিরে আসে।

রান্না চাপেনি। পুরন্দর মায়ের দিকে চেয়ে থাকে.

নিজে দেখেছে ওবেলার জল-দেওয়া চাট্টি অবশিষ্ট ভাত মা তাকে রাত্রে সানকিতে ধরে দিয়েছে।

—তোমার ?

পুরন্দর কিছুটা অনুমান করতে পারে।

মা হাসে—আমার আছে। তুই খা দিকি।

পুরন্দরের গলা দিয়ে সে ভাত নামতে চায়নি। ভাবে, সারা রাত মা জল খেয়েই কাটাবে। চোখের জলে ভাতের গ্রাস নোনতা হয়ে আসে।

বাবা ফেরে অনেক রাত্রে। মধু শুঁড়ির দোকান থেকে বের হয়ে অন্য কোন দিকে ঘুরে এসেছে। নেত্য অনেক সয়েছে, আর যেন পারে না। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করে—কতদিন এইসব চলবে বলতে পারো ?

তারপরই শুরু হয় ওই কাণ্ড।

পুরন্দর দেখেছে মাকে মারছে বাবা। লাথি চড়

সে গিয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম ভয় করতো। তারপর আর করে না। মনে মনে রাগটা জমা হয় শুধু।

কিন্তু বাবার অত্যাচারের মাত্রা আজ ছাড়িয়ে উঠেছে।

ওই লোকটার রোজগারের অন্ন আর ছোঁবে না—ঘৃণা আসে। মাকেও ওর হাত থেকে বাঁচাবে—যেভাবে হোক।

রক্তগুলো ধুয়ে ফেলেছে। বেদনাও ক্রমশ থিতিয়ে আসে। কি ভাবছে পুরন্দর। পথের কথাই ভাবছে। বাঁচবার পথ তার চাই।

সকালেও বের হয় না ঘর থেকে। চুপ করে বসে থাকে।

মা একবার এসে দেখে গেছে। নেত্যও ছেলেকে কেমন সমীহ করে। বড় হয়ে উঠেছে ছেলে। সারা গ্রামের লোক কাল তাকে কত সম্মান করেছে। আর কালই ফকীর ওকে জানোয়ারের মত মেরেছে। কিছুই বলেনি পুরন্দর। সয়েই গেছে সব। কথাটা ভাবতে তার দুঃখ হয়।

ইচ্ছে করলে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারতো। তা দেয়নি।

কেমন অস্বাভাবিক ভাবে চুপ করে আছে পুরন্দর।

মাকে দেখেও কিছু বলল না।

মনে মনে কি যেন সে ভাবছে। নেত্যর ওকে আজ দেখে মনে হয় যেন এক রাতেই পুরন্দরের বয়স অনেক বেড়ে গেছে।

বলিষ্ঠ সবল একটি কিশোর, সবে কৈশোরের সীমা পার হয়ে যৌবনে পা দিতে চলেছে। মা এগিয়ে আসে ওর কাছে।

গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে থাকে।

—খুব লেগেছিল, না রে?

—না।

জবাব দিল পুরন্দর। মা বলে ওঠে ঃ

—কিছু খাবি না?

পুরন্দর বাইরের সোনারোদভরা বাঁশবনের দিকে চেয়ে জবাব দেয়।

—খেতে তার ইচ্ছে নেই।

মা বের হয়ে গেল চুপ করে।

ন্যাড়া করিতকর্মা ছেলে, রামপদও সেই জাতের।

তাই সদাশিবপুরের বিশু মোড়লের বাড়ির লোকটাকে নিয়ে সেই-ই পাকা কথা বলে, দুগ্‌গা বলে ধরে ফেলল প্রথম বায়না।

কালকের রাতের পুতুলনাচ দেখেই ওদের ভালো লেগেছিল। ছেলেবয়সী ক'জন তরুণের দল। পড়ালেখাও জানে—ভালো পালা বেঁধেছে। তাই লোক এসেছে বায়না করতে।

বিশু মোড়ল ওই দিগরের থাকা লোক। বেশ বড় জোতদার। রমরম চলতি, আর বেশ দিলওয়ালা পুরুষ।

তারই গোমস্তা এসেছে নিজে কথা পাকা করতে।

ন্যাড়া যাত্রার দলে এতাবৎ কাটিয়েছে। দরদস্তুর হালচাল কিছুটা জানে। দলের যাতায়াতের ব্যবস্থা, থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব,—সবই পাওনাওয়ালার, নায়ক-পক্ষের।

ন্যাড়া সব খতিয়ে বেশ হিসাব করেই বলে :

—আজ্ঞে, ফি রাতে পঞ্চাশ টাকা লাগবে। গান আর পুতুলনাচ, সি দেখে লেবেন কেনে।

—পঞ্চাশ টাকা!

গোমস্তা দরটা মনে মনে হিসাব করে নেয়। অবিনাশ অধিকারী নেয় দেড়শো। তার তুলনায় অনেক কম, আর অবিনাশের দলও একটু পড়তির মুখে। বয়স হয়েছে অবিনাশের। দর খুব বেশী বলেনি ন্যাড়া। তবু যেন নিমরাজী হয়, এমনি ভাবখানা। তবু বলে চলেছে গোমস্তামশাই :

—তা চলো, মূল গায়েনের কাছে। বায়নাপত্র হয়ে যাক। তা বাপু, দশ টাকা কমাও, দু'পালা গান হবে।

ন্যাড়া বলে ওঠে :

—দশ টাকা যদি মোড়লমশায়ের দিতে কষ্ট হয়, লোব না। তবে ন্যায্য বিচার করে খুশী হলে পুষিয়ে দেবেন।

গোমস্তা বুঝতে পারে ছেলেটির কথাবার্তার ধার আছে।

রামপদ আর ন্যাড়া ওকে নিয়ে চলেছে পুরন্দরের বাড়ির দিকে।

বাড়ি বলতে মাটির পাঁচিল-ভাঙা ভিটেপুরী। খানিকটা তালপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনরকমে ঘরখানা।

ও-ঘরে বাইরের লোকদের বসবার ঠাঁই তো দূরের কথা, নিজেদেরই কায়ক্লেশে মাথা গুঁজে থাকতে হয়। গোমস্তামশাইকে কোথায় যা

বসাবে, তাই পথের মধ্যেই দাঁড় করিয়ে দৌড়ল রামপদ পুরন্দরের সন্ধানে।

পুরন্দর চুপ করে বসেছিল, ন্যাড়াকে দেখে মুখ তুলে চাইল।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসেছে ন্যাড়া, হাঁপাচ্ছে।

—কিরে? পুরন্দর অবাক হয়।

ন্যাড়া বলে ওঠে:

—বায়না এসেছে ওস্তাদ। সদাশিবপুর থেকে। দু'রাত পালা গাইতে হবে—একশো টাকা—অন্য সব খরচা তাদের। তুমি আর না করো না।

কথাটা শুনে বিশ্বাস করতে পারে না পুরন্দর।

—ধ্যাৎ!

—ওই দেখ, বিশু মোড়লের গোমস্তা হাজির।

জানালা দিয়ে দেখা যায় ওকে। ন্যাড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

কি ভাবছে পুরন্দর। কথাটা তাহলে সত্যি।

কাল রাত্রের ঘটনাটা ভোলেনি, কুকুরের মত এই মার-অপমান সে হজম করবে না। দেখিয়ে দেবে নিজের পায়েই সে দাঁড়াতে পারে। দেশের লোক তাকে চিনবে! ন্যাড়া বলে ওঠে:

—যাবা নাই পুরন্দর? অনেক করে বলছে।

প্রথম এই স্বীকৃতিকে ফেরাতে পারে না পুরন্দর। মনে মনে কি ভাবছে। পথ তার ঠিকই করে নেয়। উঠে এল বাইরে। বলে ওঠে পুরন্দর:

—চল, যাবো।

ন্যাড়ার মুখে হাসির আভা।

—তালে কিন্তু দেরি করলে চলবে না। গোমস্তামশায় বলছে গাড়ি উদের তৈরি। বেলাবেলি বেরুলে তবে যেয়ে জিরিয়ে পান করতে পারবা। আর, টাকা অর্ধেক কিন্তু আগাম এইরোই দিয়ে দেবা। বুইলা!

পুরন্দর বাইরে এসে কথাবার্তা বলে পাকা করে নেয়।

রামপদ আর দোহারকি বিষ্টে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নেয়। ওরা তো যাত্রার দলে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা পুঁটলিতে তার কাপড়-গামছা জড়াতে যা সময় লাগে, তার মধ্যেই বের হয়ে এসেছে সে। এরকম একপায়ে বেরুনো তার কাছে নতুন নয়।

পুরন্দর আজ এই প্রথম বাইরে বের হল ভাগ্যের সন্ধানে। বেরুবার আগে পুরন্দর মাকে দেখে দাঁড়াল। ওর হাতে পঁচিশ টাকা দিয়ে প্রণাম করে।

—কিরে? এত টাকা! নেত্য অবাক হয়!

পুরন্দর মায়ের খুশীভরা মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—সদাশিবপুরে পুতুলনাচ দেখাতে যেছি। তারই বায়নার টাকা! প্রথম রোজকার তোমার হাতে দিলাম।

মা যেন এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। ওর মনে হয় এও যেন মিছে কথা, ওই নোটগুলোও যেন নকল। ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। স্বামীকে নিয়ে ভুগেছে। শান্তি পায়নি। দেখেছে অভাব আর অভাব।

তবু ছেলে তার মানুষ হোক।

খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে নেত্য। ওকে কাছে টেনে নেয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

প্রণাম করে মাকে।

বলে ওঠে—টাকাগুলো তুমি রেখে দাও। বাবা যেন জানতে না পারে। যদি দেরি হয় দু'-একদিন, ভেবো না।

মা ব্যাকুল চাহনি মেলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

—হ্যাঁরে, বাবাকে শুধোবি না? বলবি না যাবার কথা?

পুরন্দরের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে ওই কথায়। কঠিন স্বরেই জবাব দেয়—না। চলি মা।

জীবনের প্রথম সেই তিথিটা আজও ভোলেনি পুরন্দর। প্রথম সেই দিন যে পথে বের হয়েছিল, সেই পথ আজও ফুরোয়নি। সেই চলা এখনও থামেনি।

এই পরিক্রমা শুরুর পথে সেই থেকে চলে আসছে এই যাযাবর জীবন, ছন্নছাড়া জীবন। এ পথের ধারে ছায়া নেই।

আজও তার শেষ হয়নি। সেই পথ আজও ফুরোয়নি। আজও রোদপোড়া ধু ধু প্রান্তরে সেই পথ খোঁজে পুরন্দর।

অনেক দাম দিয়েছে, অনেক কিছু হারিয়েছে,—জীবনের মূল্যবান অনেক সঞ্চয়। হারিয়ে তারা যেতোই, তবু মনে হয় এইটাই যেন প্রধান উপলক্ষ্য।

এই বন্ধ্যা মৃত্তিকা আর ধুলোভরা পথে তার সব কিছু হারিয়ে গেছে, তবু সেই দিনগুলো ভোলেনি।

বেলা বেড়ে চলে।

সোনারোদ গেরুয়া হয়ে আসে। নির্জন বাঁশবনের ধারে ছায়াঘেরা নুয়ে-পড়া বাড়ি কেমন স্তব্ধতায় ঢাকা। কেউ যেন নেই।

চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছে ললিতা ওদের বাড়ির উঠানে।

দেখেছে ও[illegible] ফকার, মধু শুঁড়ির দোকানের দিকে গেছে। বেশ খুশী হয়েই যাচ্ছে, হয়তো মোটামুটি কিছু যোগাড় হয়েছে তার। তাই কোনদিকে তার দিশে নেই।

এই ফাঁকে দুপুরের নির্জন নিস্তব্ধতার মাঝে এসে পড়েছে ললিতা। কালকের রাতের সেই কথাগুলো মনে পড়ে। পুরন্দরের সমদুঃখী সে-ও।

চুপিসাড়ে এগিয়ে চলে ললিতা।

কি এক অজানা আশা-নিরাশার দোলা তার মনে। কি যেন দুরাশা নিয়ে আসছে মেয়েটা।

একটা কালো আতঙ্কের ছায়া থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় ললিতা। দুঃস্বপ্নের মত সেই জমাট আতঙ্ক তাকে ভীত ত্রস্ত করে তুলছে।

এই ঘৃণ্য নরক-জীবনের আতঙ্ক তাকে স্তব্ধ নির্বাক করে দিয়েছে। এই আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে চায় সে।

পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায় নতুন করে।

চারিদিকে সুন্দর পরিবেশ। রোদভরা ছায়াঘন বাঁশবনে সুর ওঠে।

পাখী ডাকছে। দোয়েল-কোকিল-ফিঙে-হরিয়াল—আরও কত পাখী। সবুজ কচুগাছের বুকে ফুটে রয়েছে গাঢ় হলুদ ফুলগুলো। কেমন উদাস তীব্র গন্ধ ওদের।

ললিতার মনে নীরব চিন্তার ছায়া নামে অমনি।

—পুরো !

সাবধানে সরে এল মেয়েটা।

বন্ধ জানালাটায় এসে টোকা দেয় ললিতা।

ডাকছে পুরন্দরকে। চারিদিকে চেয়ে দেখল একবার।

কোন সাড়া নেই।

আবার টোকা দেয়। ওর গলার স্বর কেমন বেদনামাখানো।

—পুরে ! এ্যাই !

কেউ কোন সাড়া দেয় না। ছায়া আর বৈকালের আধো-আলোয় বাড়িটা নিস্তব্ধ। কি ভেবে বাড়ির ভিতরে এগিয়ে গেল। কাউকে দেখতে পায় না ললিতা।

কেমন চমকে ওঠে। বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থাকে।

পুরো যে ঘরটায় থাকে, বাইরে থেকে তার দরজা বন্ধ, আলনায় পুরোর ধুতি পিরান, তাও নেই।

দু'চোখ মেলে কিসের সন্ধান করছে সে।

ওদিকে বসে পুরন্দরের মা চালের খুদ বাছছিল। পুরন্দরের টাকায় আজকের খাবার জুটেছে—বেশ ক'দিনই চলবে—আর কিনেছে একটা

নতুন শাড়ি। মনটা ভালোই আছে—পুরন্দরের জন্য মাঝে মাঝে একলা ঘরে মনকেমন করে।

ওকে দেখে বলে ওঠে—আয়। পুরোকে খুঁজছিস ?

একটু চমকে ওঠে মেয়েটা, পালিয়ে আসবার পথ নেই।

কথা কইল না ললিতা। বাধ্য হয়েই ওইদিকে এগিয়ে যায়।

কেমন নিজেকেও অপরাধী বলে মনে হয়। মা বলে ওঠে—সে তো আজ সকালেই চলে গেছে।

চমকে ওঠে ললিতা। অজান্তেই তার বুক চিরে একটা আর্তনাদ ওঠে।

ললিতা বলে ঃ—চলে গেল! কোথায় ?

—হ্যাঁ। সদাশিবপুর গেছে, পুতুলনাচের জন্যে। দু'-তিন রাত্রি থাকবে। আবার যদি কোথাও বায়না হয়, সেখানেও যাবে। কবে ফিরবে কে জানে।

ললিতার মনে হয় যেন রাগ করেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে পুরন্দর। বাবার সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে গেছে।

পুরুষমানুষ চুপ করে সব অত্যাচার সইতে পারে না। কিন্তু ললিতার জীবন আলাদা খাতে বইছে। কালকের রাত্রের চরম লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ে তার।

কিন্তু সে! সে তো পারেনি। চুপ করে মুখ বুজে সয়েছে। আতঙ্ক আর জ্বালা—ভয় ঘৃণা সব তার মন ছেয়ে ফেলে।

কালো ছায়ার মত তাদের সব আলো লুটে নিল।

ওই রাঙাবাবু—আর নিষ্ঠুর ফকীরের দল। জানে ললিতা—ঘা খেয়ে পথে একবার যে বের হয়, পথ থেকে সহজে সে আর ফেরে না।

পথে বার করে দিল পুরন্দরকে তাই ওরা।

আর বন্দী করে রাখল তাকে।

নেত্য মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে।

—বসবি না ?

—না। কাজ আছে। যাই।

ওর মায়ের কথাগুলো যেন দূর থেকে কানে আসছে। দাঁড়াল না ললিতা, বের হয়ে এল।

ছায়ায় ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকার। বাঁশবনে হুহু ঝড় উঠেছে। কেমন বিশ্রী লাগে।

ফাঁকা, শূন্য লাগে বুকের ভিতরটা। অমনি হুহু করে।

কান্না আসে ললিতার। ওই ছায়াঘন বাঁশবনের নির্জনে ভয়ে, অপমানে আর হতাশায় কাঁদছে ললিতা গোপনে।

পায়ে পায়ে বের হয়ে এল ঘন বাঁশবন থেকে নিজের অজানতেই।

সন্ধ্যার অবছা অন্ধকারে মাঠ গাছ ঢাকা পথটা ভরে উঠেছে। পাখীগুলো ফিরছে বাসায়, কলরব করছে। তাদেরও আশ্রয় আছে; কিন্তু তার জন্য কোথাও কোন আশ্রয় নেই।

সব মুখ বুজে সইতে হবে। পুরন্দর ছিল—তাকেও এরা সরে যেতে বাধ্য করেছে নিষ্ঠুর অপমানে।

তবু সে বাঁচুক—বড় হোক দেশের লোক তাকে চিনুক। পুরন্দর বড় ভালো—তাই ভালো লাগে ললিতার।

অন্ধকারে হারিয়ে যাবে ললিতা—এ পাড়ার সবাই। ওরা বিষাক্ত রোগে ঘেয়ো-কুকুরের মত ঘেড়ে কেঁদে ছটফট করে মরবে। এই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে তারও নিষ্কৃতি নেই।

এই তাদের নিয়তির অমোঘ বিধান

মাসী সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে ভক্তিভরে তুলসীমঞ্চে প্রণাম করছে। ঘর যেমনই হোক্—তবু এ ঘর। তাই ভক্তির অভাব নেই।

কোথায় শাঁখ বাজছে। এমন সময় বাড়ি ঢুকল ললিতা—স্তব্ধ থমথমে মুখ। টলমল করছে দুচোখ।

সব জানে মাসী। ওর চর-অনুচর আছে, ললিতার খবর সে পায়। মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে।

নোটন বুড়ো ও-সব খবর রাখে, পুরন্দরের খবরও জেনেছে তার কাছেই। মাসী সব জেনেও কিছু বলেনি। পুরন্দর আজ চলে গেছে শুনে খুশী হয়েছিল।

তাই ললিতার যাবার সময়েও তাকে বাধা দেয়নি। ভ্রমরের জাত —বয়সকালে এমন ঘুরবেই এ-ফুলে ও-ফুলে—তারপর অন্যত্র ফুলের সন্ধান পেলে আর যেখানে-সেখানে যাবে না। ঘুরেও মরবে না।

তবু মাসীর মনে মনে এই আদিখ্যেতা ভালো লাগে না। ললিতা এত সব ছেড়ে একটা সাধারণ গরীবের ঘরের ছেলের পিছনে ঘুরছে— এটা ভাল লাগে না।

তাই ওকে ফিরতে দেখে তাকমত একটু খোঁচা দিয়ে সংসারের সারমর্ম আর পুরুষজাত সম্বন্ধে একটু শিক্ষা দিতে চায় মাত্র। হাবভাবে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে, এই ছেঁদো মানুষের কোন দর নেই। ফুটো নৌকার কোন দাম নেই। পাড়ি দিতে গেলে ভারি বড় নৌকা দরকার।

বলে ওঠে মাসী :

—পুরো পালিয়েছে শোনলাম।

কথা বলে না ললিতা. মাসীর দিকে একবার একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল মাত্র। ও এসব জানল কোথা থেকে—মনে খটকা লাগে।

মাসী বলে চলে :

—পুরুষজাতটাই অমনি বাছা। কত মিষ্টি কথা শোনাবে, কত আশা দেবে। তারপরই ড্যাংডেঙিয়ে পগার পার। ঝাঁটা মার ও-জাতের মুখে। তাই বলি—এই তো দিন সময়; দুনিয়ায় দুখভোগ তো চেরকালই করতে হবে। যে ক'দিন পারিস—

দপ্ করে জ্বলে ওঠে ললিতা। বেশ জোর গলায় ধমকে ওঠে মাসীকে :

—থামবে তুমি!

বুড়ী চমকে উঠে থেমে গেল। ললিতা কথা বলে না। সরে গেল। ঘরের ভিতর গিয়ে হুহু কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওসব কথা বিশ্বাস করতে চায় না ললিতা। এখানে যারা আসে, তাদের সম্বন্ধে ও কথা বলা যায়।

বেইমান নয় পুরন্দর—সে-ও অনেক অপমান আঘাত সয়ে গেছে তার জন্যই। সে তাকে ঠকায়নি। ঠকেনি ললিতা। এই তার অনেক বড় শান্তির সম্পদ।

জীবনে যত নোংরামি আর যার কাছ থেকেই আসুক, পুরো তাকে ঠকায়নি। ঠকেছে তারা দুজনে। ললিতা আর পুরন্দর। আর সব্বাই তাদের ঠকিয়েছে। সব সুন্দর দিনগুলো কেড়ে নিয়েছে তাদের।

মাসী তখনও গজগজ করে :

—যা বলি তাই শোন।

বুড়ী জানে সুমতি একদিন হবেই। কাঁচা রং দু'ধোপেই ফরসা ; মনের সব দুর্বলতা কঠিন বাস্তবের আঘাতে উপে যাবে।

বাঁচার তাগিদে ও-সবের কোন দামই নেই।

কোনদিক থেকেই নেই। পুরুষের দিকেও যা, এদিকেও তাই। তাই সব প্রেম-ভালবাসাও হারিয়ে যায়—আবার শূন্য পুঁজি নিয়ে মানুষ পথ চলে নতুন করে।

রাত নামছে। গাছপালাগুলো থমথমে লাগছে।

অন্ধকার তারাজ্বলা রাত।

ললিতার বুকে জমে ওঠে জমাট ঘৃণা আর ভয়।

কিন্তু পথ নেই। কোথায় বা যাবে! তাই কাঁদে শুধু।

মাসী বলে-কয়েও থামাতে পারেনি তাকে। দুঃখ হয়। ঘরের সন্ধানই দেবে মেয়েটাকে। তবু সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক।

কিন্তু স্রেফ দুবেলা দুমুঠো ভাতের ভাবনাই মনের সব চিন্তা ভরে তোলে।

কাহ্ন বলে—মেনেই নিতে হবে ললিতা, পেথম পেথম আমিও কাঁদতাম। অঝোর কান্না। শেষমেষ দেখলাম—কেউ এলো না বাঁচাতে। দূর থেকেই সবাই দরদ দেখালে, কেউ বা উপকার করার ছলে সর্বনাশ করতে এল। বাঁচবার পথ পেলাম কই? এত ভালোবাসা ভালো লাগা সবই ভোঁ ভাঁ। বাঁচতে হবে তো! তাই সব কিছু সহজ করেই মেনে নিতে শিখলাম সব ভুলে।

ললিতা ভাবতে পারে না, এই জীবনকে মেনে নিতে হবে। এই পাঁকে বাস করতে হবে।

বাসন্তীকে দেখেছে। বিশ্রী রোগে ভুগছে, আজ বাতিল একটি মানুষ। পরের দয়ায় কোনমতে বেঁচে আছে।

তবু হাসে বাসন্তী যেন দুঃখ ভোলবার জন্যই। রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে সে গানও গায়।

এককালে গান গাইতে পারতো ভালো। অভ্যাসও ছিল গানের।

এখনও সেই সুরের কিছুটা গলায় আছে।

না হলে পথে পথে ভিক্ষে করতে হতো।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—বেড়াতে যাবি এ ক্ষেপে?

—কোথায়? ললিতা জিজ্ঞাসা করে।

—এদিক-ওদিকের মেলায়, ভালোই লাগবে। তবু খোলামেলা—

কি ভাবছে ললিতা।

পাঁকের অতলে যে একবার তলিয়ে যায়, সেই পিচ্ছিল পাঁকের মধ্যে থেকে তার ওঠবার চেষ্টা করা অসম্ভব। নড়াচড়া ছটফট করবে যত, অতলে ততই তলিয়ে যাবে।

তবু বাঁচবার চেষ্টা সে করবে—এর থেকে মুক্তি সে একদিন পাবেই।

কি ভাবছে ললিতা। কাহ্ন বলে চলে—যাবি, হ্যাঁ রে? সম্মাই যেছি, মাসাকে বলি তাহলে? একটু ঘুরেফিরে আসবি, তবু মনটা ভাল থাকবে।

তবু দিনকতক এই পরিবেশ থেকে বাঁচবে।" ওই রাতের অন্ধকারের জানোয়ারের দলের নিষ্ঠুর লোলুপ চাহনি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

আর পুরন্দর!

পুরন্দরকে এ কালামুখ দেখাতেও লজ্জা করে।

সবই শুনবে সে ফিরে এসে। এ পাড়ার জীবনের দুর্গন্ধ সারা গ্রামে ছড়ায়। শুনে দুঃখই পাবে পুরন্দর।

তাই এড়িয়ে থাকতে চায় ললিতা। আজ থেকে তার পথ বদলেছে।

তাই যেন সায় দেয়—বেশ, চলো ঘুরেই আসি।

কাদম্বিনী মনে মনে হাসে।

ঢেঁকির মাথা নাড়ার কথাই মনে পড়ে। পায়ের চাপে ঢেঁকি আসমানে ওঠে—মনে হয় তার সীমিত ওই ছোট্ট জায়গাটুকুতে সে আর নামবে না, কিন্তু তার এলাকার বাইরে যাবার পথ আর নেই। সেইখানেই পড়ে বার বার।

মাসী ওকে বাইরে যাবার কথাটা বলতে পারেনি, কথাটা পাড়তে বলেছিল কাদম্বিনীকে। যদি ও মত করাতে পারে ললিতার।

কাদু কথায় কথায় ওকে সেই জালে এনে জড়িয়েছে।

ললিতা শান্ত হয়—তবু এখান থেকে চলে যেতে পারবে সে।

তাই মত দিয়েছে। দুদিন তবু বিদেশে যেতে পাবে বলে।

কাদু মনে মনে হাসে ললিতার এই ভুলে।

ললিতা পুকুরঘাটে গেছে স্নান করতে।

মাসী ওৎ পেতে ছিল। বের হয়ে আসে কাদুর কাছে। এই ক'মাসের মধ্যে মেলায় মেলায় তাদের ডাক আসে। মেলা-কমিটি থেকে টাকা ও বায়না বাবদ বেশ কিছু পায়। নাচ-গানের আসর—ঝুমরীর আসর বসাবে তারা। এখানের দলের নাম-ডাক আছে।

মাসী এদিক-ওদিক চেয়ে এগিয়ে আসে কাদুর কাছে। দেখছে ললিতা ফিরছে কিনা।

গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে :

—কি বললে রে রাজরাণী আমাদের ?

হাসে কাহু—কি আর বলবে ! ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক, শেষমেষ সেই গর্ত্তেই পড়বে। যাঁবে কোথায় ?

হাসছে বুড়ী, লালচে পান-খাওয়া মাড়িদুটো ঝুলে পড়েছে, কদর্য একটা জীবের মত হাসছে।

যাবার আয়োজন করছে তারা।

পুতুলনাচের দল নিয়ে প্রথম বাইরে বের হয়েছে পুরন্দব।

অবশ্য ন্যাড়ার এ অভিজ্ঞতা আছে। যাত্রাব দলেব পঞ্চাশ-ষাট জন আসামীর সঙ্গে ঘুবে ঘুবে সব অবস্থাতেই বাঁচবাব মত, দিন চালাবার মত অভিজ্ঞতা তাব হয়েছে।

সে-ই সব ম্যানেজ কবে নেয়।

সাত জনের দল। বিশু মোড়ল তাদের ছেড়ে দিয়েছে কাছারি-বাড়ির একটা প্রস্থ। রান্নার ব্যবস্থাও হয়েছে সেখানেই। ক্ষেতেব তরি-তরকারি, পুকুব থেকে মাছ, গোয়ালেব দুধ—সবই যোগান আসে। খাওয়া-থাকার কোন অসুবিধা নেই।

খুশী হয়েছে বিশু মোড়ল। ওদের পুতুলনাচে।

বুড়ো পাইকেরী দল নয়; ছোকরা ক'জন। পড়ালেখাও জানে। আর নিজেরাই পালা বাঁধে। গান গায়।

প্রথম দিনই পুরন্দর পালা কবে তরণীসেনবধ।

এটা একবাবে নতুন। ঝকঝকে পুতুল। আর তেমনি লিখেছে সরমা-তরণীসেনের পার্ট। গানগুলোও তুলেছে ন্যাড়া ভারি চমৎকাব।

যাত্রার দলে সে তরণীর পার্ট করতো।

ভালোই করতো। এইবার সেটা কাজে লাগায়।

খামারবাড়ি ভরতি লোক। গ্রামের, আশপাশের গ্রামের, মেয়ে-ছেলে-বৃদ্ধ অনেকে এসেছে। পুতুলগুলোও চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নিপুণ হাতে ওদের নাচিয়ে চলেছে পুরন্দর কয়েকজন সাকরেদ নিয়ে। ন্যাড়া বিষ্টু পার্ট করছে। সঙ্গে বাজনাও এনেছে গ্রাম থেকে ন্যাড়া। যাত্রার দলের কয়েকজন বাজিয়েকে।

সব দিক থেকে আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি। এবং সার্থক হয়েছে এই আয়োজন। পালা জমে উঠেছে।

কান্না আসে ওদের। সরমার দুঃখে।

আর বিভীষণের পুত্রশোকে।

স্তব্ধ আসরে রামের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

পুত্র তব ভক্ত মম।
তার তরে স্বর্গলোক
হইবে রচনা।
সত্যেরে যে করে ভর
সত্য তারে করে না বঞ্চনা॥
বৃথা শোক।
অমর আত্মার তরে
মানুষের শোক নাহি সাজে॥

বিশু মোড়ল ঝরঝর করে কাঁদছে।

ছলছল করে ওঠে সকলেরই চোখ। জীবনের ক্ষণিক আনন্দ-অনুভূতি পরম সত্যের আলোয় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে একটি মুহূর্তের পুণ্যচেতনা-স্পর্শে।

বিশু মোড়ল জড়িয়ে ধরে পুরন্দরকে পালার শেষে।

—বেঁচে থাকো বাবা! খুব খুশী হয়েছি।

নোটন গোমস্তা পাশে দাঁড়িয়েছিল, এ কৃতিত্বে তারও অংশ হারাহারি আছে। সেই-ই আবিষ্কার করে এনেছে এদের। বলে ওঠে নোটন :

—বলেন কত্তাবাবু, আমি লোক ঠিক চিনি কিনা?

ন্যাড়া ফস্ করে বলে : তা আর চেনবেন না! তাই—

ন্যাড়ার মুখে কিছুই আটকায় না। কথাটা প্রকাশ করে দিতে পারে। গোমস্তাও ধূর্ত লোক, টের পেয়েছে দর থেকে দশ টাকা যে কমিয়েছে—ওটা তার কমিশন—সেই গূঢ় তথ্যটা যেন ফাঁক করে দেবে ওই ন্যাড়া।

তাই বলে ওঠে গোমস্তা—সে সবের জন্যে ভাবতে হবে না। টাকাপয়সা বড়কত্তার হাতের ময়লা। দু'টাকা বেশী চাও, দরবার করলেই মঞ্জুর হয়ে যাবে।

কর্তা বলে ঃ

—যাক, আরও দু'দিন পালা গাও তোমরা। পয়সাকড়ির ব্যাপারে ভাবনা নাই। তোমাদিকে ঠকাবো না।

জিব বের করে পুরন্দর লজ্জায়।

—কি যে বলেন! আপনি পিতৃতুল্য, উৎসাহ দিয়েছেন—এই ঢের।

পুরন্দরের কথাবার্তা বেশ ঠাণ্ডা। বুড়োর ভালো লাগে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেওয়াটা।

বড়কর্তা ওকে কাছে টেনে নেয়।

ভাল লাগে ছেলেটিকে, দুচোখে ওর বুদ্ধি আর নম্রতার ছায়া। ওরা সাধনা করলে বড় হতে পারবে। বলে ওঠে ঃ

—বড় হও বাবা! জীবনে আমারও কিছু ছিল না। নিজের চেষ্টায় আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে যৎসামান্য কিছু করেছি। ওই যে বললে না—সত্যেরে যে করে ভর, সত্য তারে করে না বঞ্চনা—খুব ঠিক কথা। বড় ভাল কথা। জীবনে তাই সত্যকে কোনদিন অপমান করিনি বাবা।

ক'দিনেই সদাশিবপুর বকুলগ্রাম মামুদপুর মারুট আরও কত গ্রামগ্রামান্তরে পুরন্দর অধিকারীর নাম ছড়িয়ে পড়ে। টাকা-কাপড়-বাসনপত্রও অনেক প্যালা পেয়েছে পুরন্দর।

মোড়লগিন্নী পুরন্দরের মায়ের জন্য দিয়েছে কড্ডের একটা কেঠের লালপাড় শাড়ি।

যে ভাবে মাথা নীচু করে দুরুদুরু বুকে এসেছিল পুরন্দর, সেই শঙ্কা-সংকোচ তার কেটে গেছে। সে আজ এ মুলুকে পরিচিত হয়ে উঠেছে। নিজের উপর বিশ্বাস এসেছে। বড় আসরেও সে পারবে এবার পাল্লা দিতে।

ফিরছে মাথা উঁচু করে।

প্রায় পনেরো-বিশ দিন কেটে গেছে এ-গ্রামে সে-গ্রামে ঘুরতে।

আরও বায়না আসছিল, কিন্তু নেয়নি পুরন্দর।

—না রে, বাড়ি ফিরবো।

ন্যাড়া বলে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি, হ্যাঁরে পুরো?

পুরন্দরের বাড়ির জন্য মনকেমন করছে। অনেকদিন একসঙ্গে বাড়িছাড়া, মায়ের অবস্থা কি হবে তা জানে। রোজ দু'বেলা খেতে বসে মায়ের কথা মনে পড়তো। চোখ ছলছল করে ওঠে।

বেশ জানে সে বাবার অত্যাচারে আর লুটপাটে ঘরে খাবারও থাকবে না। মা-ও তেমনি। উপোস দেবে, তবু কারও কাছে হাত পাতবে না। বলবে না কোন কথা কাউকেই।

পুরন্দর আর-একজনের কথা ভোলেনি। প্রায়ই মনকেমন করে তার জন্য।

সে ললিতা। তার প্রতি একটা দুর্বলতা রয়ে গেছেই। কৃতজ্ঞতাও।

তাকে এই পথে এগিয়ে দিয়েছে সেই-ই। উৎসাহ দিয়েছে, রাত্রি-নির্জনে এসেছে,—ওর নিবিড় সান্নিধ্যে জীবনের একটি পরম মুহূর্তকে অনুভব করেছে পুরন্দর।

বড় হতে হবে তাকে। এগিয়ে যেতে হবে।

ললিতা সেই কথাই বলতো—মস্ত লুক হবে তুমি।

সাত-পাঁচ ভেবে ন্যাড়ার কথায় তাই জবাব দেয়ঃ

—এত লোভ ভালো নয় রে! অনেকদিন বাড়িছাড়া, বাড়ির জন্য

মন কি করছে। চল,' ফিরে যাই। পরে আবার নতুন পুতুল, নতুন পালা নিয়ে বেরুবো।

এ যাত্রা তাদের শুভ হয়েছে। আবার নতুন করে পালা নিয়ে বের হতে হবে সামনের মরসুমে, তাই সময় দরকার। কথাটা তাদেরও মনে ধরে।

অনেকগুলো টাকা পেয়েছে। কয়েক শো কাঁচা টাকা। আর জিনিসপত্রও অনেক।

ন্যাড়া-রামপদই বলে—পাকাপাকি দল গড়তে হবে এইবার। চট-কানাত, এটা-সেটা কেনা বাবদ বেশী টাকাই রাখ, বাকী টাকা সম্মাই কিছু কিছু লোব যদি থাকে। দল গড়বার খর্চা আগে।

দল গড়বার জন্য তারাও উঠে পড়ে লেগেছে।

বেশ উৎসাহভরেই তারা মেতে উঠেছে। সবে নতুন হাতেখড়ি পুরন্দর বুঝেছে দল-পালা আরও ভালো করা যায়। করবেও সে।

একটা রোজগারের রাস্তা হবে। ন্যাড়া যাত্রার দলে আর যাবে না। সেখানে মান-খাতির থাকে না।

আর অধিকারীও তেমনি ঠ্যাটা। মাইনেকড়িও দেয় না—কি হবে সেখানে বেগার দিয়ে!

এ তবু নিজেদের দল! এর থেকেই কিছু হবে।

তাই বলে—বেশ, ফিরে যেয়ে তাহলে গাঁয়ে ক'দিন থেকে চল কেনে মেলায় বেরুই।

—মেলায় যাবি?

একটু অবাক হয় পুরন্দর। পাকাপাকি পেশাদার দল না হলে ওখানে কেউ যেতে সাহস পায় না।

এ পথে আছে অবিনাশ অধিকারী, নটু গোসাঁই, আরও নামজাদা পুতুলনাচিয়ে। বাঘা বাঘা লোক তারা।

তাদের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চলেছে এবার পুরন্দর।

মনে মনে কেমন ভয় জাগে। ভালোও লাগে না।

ন্যাড়া বলে—কেন যাবো না? আমরাও কি কমতি নাকি? আসর মাৎ করে দোব, চল কেন্নে।

কথা বলে না পুরন্দর।

ওরা গ্রামের দিকে ফিরছে। মনে অনেক আশা আনন্দ। সবদিক থেকেই তারা খুশী হয়ে ফিরছে।

গুনগুনিয়ে গান গাইছে ন্যাড়া।

মাঝে মাঝে পুরন্দরের দিকে চেয়ে থাকে। ওর বাড়ি যাবার এত তাড়ার মানে ঠিক বোঝে না। কোথাও কিছু টান আছে কিনা, তাও জানে না। কেমন খটকা লাগে।

পথে পাঁচতোপীর বাজারে ঢুকে খেয়াল হয় পুরন্দরের। বলে ওঠে:

—একটা শাড়ি কিনবো।

কিছু নিয়ে যাবে ললিতার জন্য। অনেকদিন দেখেনি। তাকেও কিছু দিতে মনে হয়। কাপড় পছন্দ করে চলেছে দোকানে।

—বেশ রঙীন চাই কিন্তু।

ন্যাড়া চুপ করে থাকে।

রঙীন শাড়িখানা নিয়ে পথে নামতেই ন্যাড়া ফস্ করে বলে ওঠে:
—কি রে, এত শাড়ি কেনার ধুম? ললিতার জন্যে লয় তো? এ্যাঁ?

ন্যাড়া প্রথমে ভেবেছিল ওর মায়ের জন্য কিনছে বোধহয়, কিন্তু রঙীন শাড়ি দেখে কথাটা ওর উর্বর মাথায় গজিয়ে উঠেছে। বলে ফেলে ফস্ করে।

একবার ওর দিকে চাইল পুরন্দর।

ন্যাড়াও অবাক হয়েছে ওকে দেখে।

ওর চোখে নীরব থমথমে চাহনি। ন্যাড়ার মুখ থেকে ওসব কথা শুনবে, এটা পুরোও আশা করেনি। চুপ করে গেল ন্যাড়া ওর চাহনি দেখে।

ধুলোঢাকা পথ—মাঠের বুকে রোদ উঠেছে। সবুজ ছোলা-খেসারির গাছগুলো কেমন একটা স্নিগ্ধ আস্তরণ এনেছে। ওরা ফিরছে মেঠো পথ ধরে।

ন্যাড়া বলে ওঠে—রাগ করলি, হ্যাঁ রে?

পুরন্দর কথা বলে না। ন্যাড়া বলে চলেছে—ওরা সব ভালো নয়. পুরো। ওই ললিতা—ওই পাড়ার মেয়েরা।

ন্যাড়া আরও কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

—কেন? পুরন্দর জিজ্ঞাসা করে।

—এমনিই বলছিলাম।

ন্যাড়া চেপে গেল কথাটা।

পুরন্দর কি জানে না আসলে ওরা কোন্ জাতের, কোন্ পথের? ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো, এ কথাটা ন্যাড়াও জানে।

ওরা আগুনের জাত—দূর থেকেই দেখতে সুন্দর। কাছে গেলে গা-জ্বলুনি তাত লাগে, হাত দিলে হাত পোড়ে।

ওরা এগিয়ে চলেছে।

তাদের গ্রামসীমা দেখা দেয়—কাঁদরের ওপারেই বড় গ্রামখানা। তাল-নারকেল গাছের মাথাগুলো আকাশে উঠেছে—এদিক থেকে ওদিকে ন্যাতাড় লাগানো। মাঝে মাঝে বড় বড় দালান—বিষ্টু-মন্দির, রায়বাবুদের বাড়িগুলো চোখে পড়ে। ওদিকেই ময়ূরাক্ষী—সবুজ গাছগাছালির আড়ালে সাদা বালি-ঢাকা বুকে দৃষ্টি হারিয়ে যায়।

ফকীরের কিছুদিন খুব কষ্ট চলেছে। কাজকর্ম করে যা মজুরি পায়, তা নেশাতেই যায়। ছেলেটাও বের হয়ে গেছে। ক'দিন বাড়িও ফেরেনি। কোথায় যেন চলে গেছে। ফকীর গুম হয়ে থাকে।

পাড়ার অনেকেই জানে সেই রাত্রে ওকে মারার কথা। ফকীরেরই দোষ। সকলে তাকেই দোষ দেয়। অনেকেই কথা শোনায়।

সোমর্থ রোজগেরে মানী ছেলে—তার গায়ে হাত তোলা খুবই অন্যায়। তাই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে।

দু-এক ঠাঁই শোনে ফকীর—পুরন্দর এখন বেশ নাম করেছে।

সেদিন হাটে দূর-দূরান্তরের চাষীদের মুখেও শুনেছে পুরন্দরের নাম। নিজেদের মধ্যে তারা পুতুলনাচের কথা বলাবলি করছে।

ফকীরের তখন তুরীয় অবস্থা। নামটা শুনেই কানে লাগে। বেগুন কেনা বন্ধ করে মুখ খোলে ফকীর।

—কি বললে? কি নাম?

চাষী জবাব দেয়—পুরন্দর অধিকারী। জবর পুতুলনাচিয়ে গো। ই গেরামেরই লোক।

একটু অবাক হয় ফকীর নামের শেষে মর্যাদার পদবী শুনে। কানে ঠিক ঠাওর পায় না। তবু জিজ্ঞাসা করে:

—কি নাম বললি বাবা ওই পুতুলনাচিয়ের?

লোকটা বলে ওঠে:

—পুরন্দর অধিকারী। নাম শোননি?

গজগজ করে ফকীর:

—শালা কিনা অধিকারী হয়েছেন! পুরন্দর অধিকারী! আস্থক শালা—বাপ হল ছুতোর, আর ব্যাটা কিনা অধিকারী! এ্যা!

বেগুন কেনা, হাট করা পড়ে রইল। হনহন করে বাড়ির দিকে ফিরল চোখমুখ লাল করে।

নেত্য সবে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গেলে তরকারি কোটবার আয়োজন করছে। মনটা ভালো নেই তার। ছেলের কথাই ভাবছে।

কতদিন বাড়ি ছেড়ে গেছে পুরো কে জানে—অনেক দিন। শুনেছে বটে দূর গ্রামে সে খুব ভাল খেলা দেখাচ্ছে। তবু মায়ের মন হুহু করে ছেলের জন্য।

তাকে কাছে দেখে নেত্য অনেক দুঃখ সইবার ক্ষমতা পায়—এ যেন অভাব আর দুঃখে ভেঙে পড়ছে। ওই জলবসা মাটির পাঁচিলের মত সব শ্রী-সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে গলে খসে পড়ছে দেহ-মন থেকে। তাই পুরন্দরের জন্য মনকেমন করে। কবে ফিরবে কে জানে?

হঠাৎ ফকীরকে ওই অবস্থায় ঢুকতে দেখে ফিরে চাইল। মাঝে মাঝে অমনি অবস্থায় ফেরে লোকটা, তাই ওদিকে চেয়ে থাকে অভ্যস্ত চাহনিতে।

পা-দুটো টলছে। গর্জন করে ওঠেঃ

—ছিনাল নষ্টা মেয়ে তুই! পুরো হল কিনা অধিকারী! এ্যাঁ! প্যাটে প্যাটে এত পাপ তোর!

ফকীরের কথায় অবাক হয় নেত্য।

—কি বলছ?

গর্জন করে ফকীর।

—এ্যাও! আজ শেষ কববো—টুঁটিতে পা দিয়ে ন্যাতার মারবো। ইর্য়াকি পেয়েছো!

ফকীর মত্তবিক্রমে চিৎকার করে লাফ দিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে। পা দিয়ে ছিটকে ফেলে দেয় ভাতের হাঁড়িটা—ছত্রাকার হয়ে পড়ে গেল বহুকষ্টে সংগৃহীত ওই আজকের মুখের গ্রাস।

হঠাৎ দরজার সামনেই কাকে দেখে সরে দাঁড়াল ফকীর। নেত্যও কান্না সামলে ছেলের দিকে এগিয়ে আসে ওই অবস্থাতেই।

—মা!

থমকে দাঁড়িয়েছে পুরন্দর।

পুরন্দর ঢুকছে। ক'দিনেই আরও যেন লম্বা-চওড়া হয়ে উঠেছে সে। ওকে দেখে যেন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে এগিয়ে গেল ফকীর ওই অবস্থাতেই। বলে ওঠেঃ

—এই যে এয়েছেন! তা, গরীবের বাড়িতে কেনে হে? যাও না অধিকারীবাবুদের দো-মহলা কোঠা বালাখানায়। এ্যাঁ, পুরন্দর অধিকারী! তালে বাপের নামটি কি হে তুমার?

পুরন্দর খুশিমনেই বাড়ি ঢুকছিল। ঢুকেই দেখেছে মায়ের ওপর ওই অত্যাচারের নমুনা। কি করে বোঝাবে লোকটাকে পুতুলনাচিয়ে দলের কর্তাকে সম্মানের চোখেই লোকে দেখে। ওই 'অধিকারী'

আখ্যায় ভূষিত করে। এত বড় সম্মানটাকে এমনি কদর্য চোখে দেখবে লোকটা, তা ভাবেনি।

মনের সব সুর খুশি এক নিমেষের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় পুরন্দরের। বাবার দিকে ঘৃণাভরে চেয়ে থাকে।

আজ ওই মদ্যপ লোকটার কথার জবাব দিতেই ঘৃণা হয়। ওকে কোন কথা বলা যাবে না এখন। শোনবার মত অবস্থা ওর নেই।

পিছনে দলের ওরা ঢুকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে।

কাপড়চোপড়, বাসন, হাঁড়ি, বোগনো, গামলা—আরও অনেক কিছু। মোড়লমশায় আসবার সময় গাড়িতে তুলে দিয়েছে দু টিন গুড়, কিছু আলু, কয়েকটা কুমড়ো।

জিনিসপত্র দেখেই হোক, আর ভিন গাঁয়ের মুনিষদের দেখেই হোক, ফকীর তখনকার মত চুপ করে বের হয়ে গেল ওদিককার বেড়ার ফাঁক দিয়ে। পুরন্দর মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। ওকে দেখছে।

বেশ বুঝতে পারে মায়ের উপর এ ক'দিনে কি ধকল গেছে। এখুনিই একপর্ব প্রহারও শুরু হত সে না এসে পড়লে।

মা সহজভাবেই চোখের জল মুছে ছেলেকে কাছে টেনে নেয়। পুরন্দর মায়ের পায়ের কাছে গরদখানা নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করে।

খুশীতে কাঁদছে নেত্য। ঝরঝরিয়ে কাঁদছে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—বেঁচে থাক বাবা।

বাড়ি ঢুকছিল ফকীর। খিদে পেয়েছে তার। ওটাকে ভোলা যায় না।

দূর থেকে মা-ছেলেকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

গজগজ করছে লোকটা। নীরব রাগে জ্বলছে আর ফুলছে। মা-এবং ছেলে দুজনে মিলে তাকে যেন বাইরে রাখতে চায়।

সবাই তাকে ঠকাচ্ছে। ফকীরও ছেড়ে দেবে না। দেখে নেবে সবাইকে।

মা-ছেলের ওই পরিবেশে সে বেমানান। চোরের মত চুপিচুপি বাইরে এসে বসল একটা কাঠের গুঁড়ির উপর। খিদেতে গা-হাত-পা ঝিমঝিম করছে ফকীরের।

পুরন্দরের ওই পরিবেশে মন টেকে না। কেমন যেন একটা অশুভ ছায়ার মত বাবা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি বলতে চায় লোকটা! এরই মধ্যে মদ খেয়ে ওর চোখ-মুখে একটা কদর্য ছায়া পড়েছে। কাজকর্মও তেমন করে না।

মাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি পুরন্দর, মা হয়তো দুঃখ পাবে। কিছু টাকা মা-র হাতে তুলে দিয়েছে। মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

—এত টাকা!

নেত্য এত টাকা জীবনে একসঙ্গে দেখেনি। বিশ্বাসই করতে পারে না তার এই সৌভাগ্য।

মায়ের দিকে চেয়ে থাকে পুরন্দর।

এগিয়ে এসে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলে:

—হ্যাঁ, লোকে দিয়েছে খুশী হয়ে।

মা-ও খুশী হয়। মাথায় ঠেকিয়ে বলে—একদিন সত্যনারায়ণ পূজো দোব। কি বলিস?

—বেশ তো। তবে বাবা যেন জানতে না পারে। তাহলে ও টাকা আর পাবে না।

হাসে মা। ঘাড় নাড়ে। জানে না তার বাবা। নেত্যর মনে মনে ইচ্ছে ঘরবাড়ি সারাবে, জমিজেরাতও কিনবে কিছু এইবার! তারপর!

এভাবে চিরকাল যাবে না। পুরন্দর সংসারী হবে।

সন্ধ্যা নামে।

ক'দিন বাইরে থেকে শরীরটাও বেযুত হয়েছিল পুরন্দরের। দুপুর থেকে টানা ঘুম দিয়ে যখন উঠল, বৈকাল হয়ে গেছে।

এই সময়টা বেশ লাগে পুরন্দরের। নিস্তব্ধ বাড়ি, চারিদিকে ছায়া আর আঁধার-মেশা সবুজ। বাঁশবনে হাওয়া কাঁপে। বাতাসে আতাফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে।

একটু বের হল।

ললিতা আসেনি। অন্য সময় সে আসতো—হয়তো ফেরেনি তাই জানে। মাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারে না পুরন্দর ওর কথা।

কেমন লজ্জা করে।

আগে করতো না। সেই হঠাৎ-আবিষ্কৃত সম্পদের অস্তিত্ব যেদিন পেয়েছিল ওর মধ্যে, সেই দিন থেকে দুজনের মধ্যে নিভৃত একটি স্বপ্নজগৎ রচিত হয়ে গেছে।

মাকে, কাউকেই সেই সম্পদের কথা জানানো যায় না। পুরন্দর জানাতেও চায় না কাউকে সে কথা।

চুপি চুপি শাড়ির মোড়কটা হাতে নিয়ে বের হয়ে এল পুরন্দর।

নাথপাড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

কেমন নিশুতি হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। কোলাহল, সুর, সাড়া—কিছু নেই। আলোও বড় একটা জ্বলে না।

একটু অবাক হল পুরন্দর আবছা আঁধার-ঢাকা পাড়ায় এসে।

কেমন খটকা বাধে। ললিতাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ডেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না।

আলো নেই। সদর দরজাটা বন্ধ। তালা ঝুলছে বাইরে।

কেউ কোথাও নেই। জমজমাট পাড়াটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মানুষগুলো কোথায় ফেরারী হয়েছে আজ।

আবছা অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। ললিতাও নেই, থাকলে তার কলকণ্ঠ ভেসে উঠতো। ওদিকে কাদুর ঘরও বন্ধ। সুর ওঠে না।

ওরা কোথাও হয়তো গেছে কাছাকাছি। দাঁড়াবে কিনা ভাবছে পুরন্দর, হঠাৎ আঁধারে কার গান শুনে এগিয়ে যায়। শীর্ণ চেহারার একটা প্রাণী আঁধারে হাসছে। হাসছে মেয়েটা।

এ পাড়ার সবাই চলে গেছে মরসুমে—মেলায় মেলায় বেসাতি করতে। যায়নি সে। পড়ে আছে।

যাবার সামর্থ্য তার নেই, রোগজীর্ণ দেহ।

পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় বাসিনী। যদি কিছু আহার্য জোটে।

এগিয়ে এসে বলে মেয়েটা :

—ও তুমি নাকি হে ? এ্যাঁ ! ললিতার লতুন লাগর !

হাসিতে ফেটে পড়ে বাসিনী।

—ওরা কোথায় ? পুরন্দর একটু বিরক্তিভরে শুধোয়।

বাসিনী এগিয়ে আসে, কি দেখছে ওকে।

বলে ওঠে—আবার কোথায় ! পাখী উড়েছে—বুঝলে, এখন মেলায় মেলায় ঘুরে ফুলে ফুলে মধু সন্ধান করছে। যে পাখীর জন্যে এত ভাবনা, সে পাখী তো ফুরুৎ ধা। জানো না ! এ্যাঁ ! মরে যাই, মরে যাই !

বিকৃতকণ্ঠে গাইতে থাকে বাসিনী—

বদ হাওয়া লেগেছে খাঁচায়,
পাখী কখন উড়ে যায়॥
কার বা খাঁচা কার বা পাখী,
কারে আপন কারে পর দেখি—
ওরে কার জন্যে ঝুরে আঁখি—
পাখী কারে বা কাঁদাতে চায় !
বদ হাওয়া লেগেছে খাঁচায়।

এককালে ভালো ঝুমুরী গাইত বাসিনী। দূরদূরান্তরেও গেছে গান গাইতে। আজ ধুঁকছে—মরবে এইবার গলে পচে ঘেয়ো কুকুরের মত।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে পুরন্দর। সারা পাড়াটা শূন্য, কেমন মন খাঁ খাঁ করে।

ফিরে চলে আসবে। ললিতা নেই। পুরন্দরের কাছে সব খালি বলে বোধহয়।

ললিতা আজ উধাও হয়ে গেছে। সব কেমন জমাট আঁধারে ঢেকে আসে। এ গ্রামের সারা আকাশ।

হঠাৎ মেয়েটার ডাকে থামল।

—কি এনেছ হাতে? নিশা?

—না, কাপড়।

বাসিনী কাতর অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলে:

—দেবা উখানা? পরনের কিছু নাই। এ্যাই দ্যাখ না, ত্যান্না পরে রইছি।

পুরন্দর ওর দিকে এতক্ষণ চায়নি, আঁধারে ঠাওর হয় পরনের কাপড়খানাও জীর্ণ, ওর ওই শরীরের মতই।

সারাদেহে চোখে-মুখে একটা অনাহারের ছায়া। এ পাড়ার মূর্তিমান অভিশাপ ও। নিশ্চিত নিয়তির মত ঘুরছে আর এ পাড়ার শেষবিধান দিয়ে চলেছে।

কাপড়খানা ওর হাতে তুলে দিয়ে বের হয়ে এল পুরন্দর।

এ পাড়ার আঁধারনামা পঙ্কিল বিষাক্ত পরিবেশে বাসিনী পচছে।

ললিতাও আজ এদের সামিল হয়ে গেছে বোধহয়। এ ছাড়া পথ তার নেই।

কোন পথই ছিল না। তা বেশ অনুমান করেছে পুরন্দর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে পুরন্দর বাইরের পথে।

নিজের মতই সে-ও এমনি ঘরে-বাইরে জ্বলছে।

সেই জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে হয়তো। হারিয়ে গেছে ললিতা।

সারা মনে একটা শূন্যতা বোধ হয়।

এতদিন ললিতা তার জীবনে কতখানি ঠাঁই জুড়ে ছিল, ঠিক অনুমান করতে পারেনি। ভাবেওনি পুরন্দর।

দিনরাত্রি দেখেছে তাকে, চিনেছে। কাছে পেয়েছে, তাই অভাব বোধ হয়নি।

মাটি, যেটা অহরহঃ পায়ের নীচে থাকে, সেটার সম্বন্ধে কোন চেতনা-বোধই থাকে না মানুষের। ওর থাকাটা নিশ্বাসবায়ুর মতই সহজ স্বাভাবিক।

কিন্তু না থাকলেই সমূহ বিপদ—অস্তিত্বটুকুও মুছে যাবার উপক্রম হয়, তখন বোঝা যায় কত বড় এর প্রয়োজন। তার জীবনে ললিতা যেন তেমন একটি আশ্রয় ছিল বলে আজ বোধ হয়। হারিয়ে গিয়ে তাকে আজ চিনতে পেরেছে নতুন করে।

তারাগুলো জ্বলছে আকাশে—অসংখ্য তারা।

নির্জন মাঠ পেরিয়ে ময়ূরাক্ষীর বুকে শুধু ধোঁয়াটে কুয়াশার আস্তরণ নেমেছে। ঝিঁঝি ডাকছে।

এ গ্রামে জন্মেছে—মানুষ হয়েছে সত্যি, কিন্তু এ মাটিতেও সে পরবাসী। এতদিন সে নিজের কাজ নিয়েই ছিল, কারোও সঙ্গেই মেশবার অবকাশ পায়নি। নিজের স্বপ্ন আব ওই পুতুল নিয়েই ছিল। তাই আজও সে একা।

কোথাও যে যাবে, তারও ঠিকানা নেই।

ফিরছে বাড়ির দিকে পুরন্দর।

পথে ন্যাড়াকে দেখে দাঁড়াল।

ন্যাড়া ইতিমধ্যেই সাজবেশ বদলে ফেলেছে। পরনে রঙীন পাঞ্জাবি, মাথায় বাবরি চুল বেশ তেল-চুকচুকে। ওকে নাথপাড়ার দিক থেকে ফিরতে দেখে একটু অবাক হয়। বলে ওঠে ন্যাড়া—তুমি! এদিকে কোথা গিইছিলে এই রাতের বেলায়?

পুরন্দর জবাব দিল না।

ন্যাড়া ওর কাছে এগিয়ে আসে। পুরন্দরের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন সন্দেহের ছায়া ন্যাড়ার চোখে। ক্রমশঃ সহজ হয় ন্যাড়া। না, তেমন কিছু লক্ষ্য করেনি পুরন্দরের মুখে। চুপ করে চেয়ে থাকে ন্যাড়া।

পুরন্দরকে ইদানীং ন্যাড়া তার অজ্ঞাতসারেই একটু খাতির করতে শুরু করেছে। দলের মাথা ওই পুরন্দর।

ওর গুণপণা, এলেম আর খ্যাতি চোখে দেখেছে। বন্ধু বলে ভালোও বাসে। পুরন্দর তা জানে।

একটু দাঁড়াল পুরন্দর।

বলে ওঠে—কথাটা সেদিন তুই বলেছিলি ন্যাড়া, দেখলাম সত্যি।

—কি কথা ?

ন্যাড়া একটু অবাক হয়। এমন অনেক বাজে কথাই সে যখন-তখন বলে। তার সঙ্গে সত্য-মিথ্যার কোন সম্বন্ধ নেই, অন্ততঃ সত্যের। হঠাৎ তেমনি একটা কথাকে এতখানি মূল্য দিতে দেখে সে-ও অবাক হয়।

পুরন্দর বলে ওঠে—ললিতার কথা।

—অ! চুপ করে গেল ন্যাড়া। ওর দিকে চেয়ে থাকে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

পুরন্দর বলে চলেছে—ও চলে গেছে।

ন্যাড়া এইবার যেন দম ফিরে পায়। জবাব দেয় :

—যাবে ও, তা জানতাম পুরো। ওরা কেউ থাকে না। সবাই যায়। তাই ও কথা বলেছিলাম সেদিন।

ন্যাড়া ওদের চেনে। পুরন্দর দুঃখ পেয়েছে। ওদের মত নয় পুরন্দর। যাকে ধরে, সারা মন দিয়ে ধরে—দুনিয়ায় সব কিছুরই ওরা মূল্য দেয়—ওই পুরন্দরের মত মানুষেরা। তাই হয়তো পায়ও অনেক—হারায়, দুঃখ পায় আরও বেশী। ন্যাড়া বলে ওঠে :

—ওসব কথা ছাড়ান দাও পুরন্দর।

পুরন্দর কোন জবাব দিল না। চুপ করে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। মনটা কেমন অজানা দুঃখে থমথম করছে। অন্ধকার-ঢাকা পথ দিয়ে বাড়ি ঢুকল

মা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

পুরন্দর গিয়ে নিজের ছোট্ট খুপরিতে ঢোকে। চুপ করে বসে থাকে। সামনে কাগজ-কলম ছড়ানো। বইপত্রও কিছু কিনেছে। বিশু মোড়ল দিয়েছে নতুন একটা মহাভারত। রামায়ণখানা পড়ে আছে। ললিতার আনা সেই রামায়ণ।

খুলে কি দেখছে আনমনে।

জীর্ণ বিবর্ণ ছবিগুলো—লালচে হয়ে উঠেছে তার পাতা। সব মিলিয়ে একটা গন্ধ উঠছে।

ললিতার কথা মনে পড়ে পুরন্দরের। তারই সংগ্রহ করে আনা বইটা। ওই বইয়ের সঙ্গে মিশে আছে ললিতার কত স্মৃতি। তার হাসি-মাখা মুখখানা মনে পড়ে। একটি উজ্জ্বল তারার মত স্মৃতির আকাশে সে টিকে থাকে।

কিন্তু চলে গেছে ললিতা। ও পথে যে যায়, সে আর ফেরে না।

ললিতাও চলে গেছে।

সব কেমন হারিয়ে গেল পুরন্দরের।

শ্রীবৎস রাজার কথা মনে পড়ে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সব হারাল একে একে। তারপর অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় সর্বহারা একটি মানুষ।

কেমন ইচ্ছে হয় তেমনি একটা দুঃখের পালা লিখতে। রাজ্যহারা রাজা সুরথ, নাহয় ওই শ্রীবৎসের কথা। ভাগ্যের কাছে মানুষ বার বার পরাজিত হয়েছে। কর্ণের কথাও মনে পড়ে। জন্মপরিচয়হীন একটি মহাবীর; সমাজ, মা—তাকে চেনে না। অমিততেজা বীর্যবান মহারথী কর্ণ—তবু জীবন নিয়ত তার সঙ্গে পরিহাস করেছে সবচেয়ে বেশী।

তার জীবনেও নিয়তি যেন তেমনি পরিহাস করেছে। কি ভেবে কর্ণের পালাই বাঁধতে থাকে পুরন্দর।

বইও কিনেছে একখানা। কর্ণের কথাগুলো যেন বার বার পড়ে মুখস্থ হয়ে যায়। মাকে সামনে দেখে স্বীকৃতি দিতে পারে না আজ কর্ণ। সে-ও যেন নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস কর্ণের কাছে।

—এ জীবন করেছ নিস্ফল,
ব্যর্থ করি দেছ সব
কামনা আমার।
ক্ষত্র হয়ে নহি ক্ষত্র আমি।
ববিত্ব্যাতি ধূলিসাৎ
করেছ হেলায়॥

রাত কত জানে না—লিখে চলেছে পুরন্দর। পাতার পর পাতা লিখে চলেছে। চোখেব সামনে ভেসে ওঠে নিস্ফল কর্ণেব ছবি। একটার পর একটা দৃশ্য বেঁধে চলেছে।

একে একে রিক্ত নিঃস্ব হচ্ছে দানবীর।

দেবরাজ ইন্দ্রও এসে তার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল চেয়ে নিয়ে গেল। প্রার্থীকে কোনদিন বিমুখ করেনি সে।

—পুরো!

কার ডাকে থামল পুরন্দর।

বাইরে কত রাত জানে না। মা ওকে ডাকছে।

—শুবি না?

—একটা কাজ সেরে তবে শোব।

নেত্য ছেলেব দিকে চেয়ে থাকে, কেমন যেন পর পর—অনেক দূরের কেউ বলে মনে হয় ছেলেকে।

ভয় হয়। কেমন হারাবার ভয় জাগে নেত্যর মনে।

পুরোকে দেখে মনে হয় তার ঘরে এমন ছেলে কি করে এল? এ বাড়ির ধাতের নয় সে। স্বতন্ত্র পৃথক একটি সত্ত্বা।

বাবাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি সে। কথাও বিশেষ বলে না। মাকেও যেন কেমন দয়া করে ভালবাসে। এই ঘরে ও যেন সত্যি বেমানান।

ছোট্ট এই নুয়ে-পড়া ঘর ওকে ধরে রাখতে পারবে না বোধহয়। মায়ের মন তাই হুহু করে নীরব বেদনায়।

মা সরে এল।

পুরো আবার কাজে ডুবে যায়।

দু'দিন বাড়ি থেকে বের হয়নি। পালা শেষ করে পুতুল নিয়ে পড়েছিল। রামপদ আর ন্যাড়াও রয়েছে সঙ্গে।

নতুন পালা ঠিক হয়েছে। তারই তোড়জোড় চলেছে।

ক'দিন তাই নিয়েই কেটে গেল। পুরন্দরের কোনদিকে হুঁশ নেই।

কাজ শেষ হবার পরই মনে পড়ে সেই কথাটা পুরন্দরের।

ললিতা নেই। এখানে আর সে নেই। দেখাও হবে না।

যাকে ভোলবার জন্য এমনি কাজের অতলে ডুবে ছিল, সে যেন তবু তার সারা মনে জড়িয়ে রয়ে গেছে। তাই ললিতাকে ভুলতে পারে না পুরন্দর এত চেষ্টা করেও।

ন্যাড়া বলে—খাসা পালা হইছে পুরো!

পুরন্দর ভেবেছে। অনেক ভেবেছে। ভাবছে।

কেমন বিশ্রী ঠেকে। চুপচাপ বাড়িতেই থাকে।

মা বলে—একটু ঘুরে আয় বাইরে।

পুরো কথা বলে না। মা যেন ওর মনের নীরব বেদনা খানিকটা টের পেয়েছে। ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকে নীরবে।

বৈকালবেলায় ফকীরের সারা শরীর যেন বেদনায় ভেঙে পড়ে। এ সময়ে তার নেশা কিছু চাই। মধু শুঁড়ির দোকানে যেতেই হবে। কাজকম্ম ক'দিন করেওনি।

ক্রমশঃ এই লোকটার তেজ-দাপটও কমে আসছে। সুস্থ থাকলে একটা নীরব অনুশোচনা সারা মনে ছেয়ে থাকে। তাই থেকে, এই দুর্বলতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই মদের নেশায় ডুবে থাকতে চায় সে।

কিন্তু জোটেনি কিছুই ফকীরের, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না পয়সা।

পুরন্দর আজ বাবাকে দেখে একটু দুঃখ বোধ করে। লোকটা হেরে গেছে।

সে-ও নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে মাথা নীচু করেছে—তার দুর্বার আঘাতে জর্জর হয়ে উঠেছে। তাই বোধহয় ভিখারীর মতই অনুনয় করে।
—চার আনা পয়সা দিবি পুরো ?

—কি হবে ?

ফকীর কি ভাবছে। ছেলেকে আজ মুখ ফুটে বলতে পারে না কি এমন সংকাজে সে ব্যয় করবে ওই পয়সা। তবু শিরায় শিরায় অনুভব করে সে, এটার তার অত্যন্ত প্রয়োজন।

নেত্য স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

ফকীর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে।

পুরন্দর জিজ্ঞাসা করতে সঠিক উত্তরও দিতে পারে না। আমতা আমতা করে।

—এমনিই বলছিলাম।

কি ভেবে পুরন্দর একটা সিকি ওর হাতে তুলে দেয়—নাও।

পয়সা দেখে ফকীরের শীর্ণ মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ফতুয়াটা গায়ে চাপিয়ে বের হয়ে গেল তখনই। সারাদিন কাজ করবার ইচ্ছা নেই, তবু নেশা চাই।

—একটা কথা বলছিলাম মা !

পুরন্দরের দিকে চাইল ওর মা। পুরন্দর বলে ওঠে—এই করেই দিন চালাতে হবে। কাজে আর মন নেই ওর।

নেত্যও সে-কথাটা জানে। স্বামী আর কাজ করতে পারবে না। মনও নেই, সামর্থ্যও নেই কাজ করার।

সে-ও সায় দেয়—তাই দেখছি।

—তাই বলছিলাম, মেলায় যাই দল নিয়ে।

মা, ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। আজ এ ছাড়া আর পথ নেই। ছেলেকে তাই রোজগার করতে পাঠাতে হবে।

পুরন্দর মাকে যেন সান্ত্বনা দেয়ঃ

—তুমি ভেবো না মা, দল আমার ভালোই চলবে তোমার আশীর্বাদে।

মেলায় মেলায় বাইরেই বের হবে পুরন্দর দল নিয়ে।

ন্যাড়া, রামপদ আর ক'জন এই খবরের আশাতেই ছিল। এই সময় বড় বড় মেলায় মরসুম। পয়সা মাঠে পথে ছিটানো, কুড়োতে পারলেই হয়। মেলায় যাবার কথা শুনে লাফিয়ে ওঠে ন্যাড়া।

—এ্যাদ্দিনে সুমতি হল তালে!

পুরন্দর ওর খুশীতে খুশী হতে পারে না।

রামপদ বলে ওঠে—তালে দুগ্‌গা বলে কালই মঙ্গলে ঊষা বুধে পা করি। কি বল অধিকারী?

—চল। তাই যাই। বেরুতেই যখন হবে, তখন আর দেরি করা কেন?

পথেই বের হল তারা।

এই প্রথম প্রকাশ্য মেলায় ঘুরবে তারা, ঘর ছেড়ে পথে নামল।

সে আজ কত বৎসর আগে, তার সঠিক হিসাব করতে পারে না পুরন্দর। সেই পথ-চলা আজও ফুরোয়নি।

দুপুরের রোদ চিনচিন করছে। তুলোর কম্বল চাপা দিয়ে বসে আছে পুরন্দর গাছতলায়।

ঘাম দিচ্ছে। জ্বরটা ছাড়বে বোধহয়। তুলোর কম্বলটা মাথা থেকে নামাল। ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু ভালো লাগে।

—জল খাবা অধিকারী ?

কুড়োরাম ঠায় বসে আছে। ব্যাকুল দুই চোখের চাহনি মেলে বৃদ্ধ পুরন্দরকে দেখছে কি মমতাভরা চাহনিতে।

পুরন্দর কথা কইল না। চুপ করে থাকে। সারা শরীরে নেমেছে একটা ক্লান্তি।

কুড়োরাম বলে চলেছে :

—উরে বান্ তানাস্‌রে! যা দাঁতলাগা কাঁপুনি এয়েছিল, চেপে ধরেও ঠকঠকানি থামাতে পারি না। দাঁত কত্তাল বাজছে তো বাজছেই।

হাসে বৃদ্ধ পুরন্দর।

একটু সুস্থ হয়েছে। দুপুরের ঝনঝনে রোদে বহুদূর নজর যায়, খাঁ-খাঁ মাঠে কোন আশ্রয় নেই। শুধু ধুলো-ঢাকা রাস্তাটা চলে গেছে এঁকেবেঁকে ওর বুক চিরে।

ওদিকে সানাইদার গজগজ করছে :

—ধ্যাৎ শালা, এ-দলে আর যদি থাকি! চাট্টি ভাত, তাও সময়ে পাবো না।

বেন্দা বায়েন উনুনের আঁচে ভাতে কাঠি দিতে দিতে বলে— তাই যা কেনে শালা! তুই যদি কাটিস, তালে আম্মোও বাগ পাই। বলবো, সানাই আনো নালে দল ভেঙে দাও। এ দল ছেড়ে ঝুমরীর দলে বাজাবো, তবু বসে বসে থাকবো। তা নয়, কেঠোরামের গান আর ত্যানার পুতুলের নাচ! শালার ভাতও বাগ পেয়েছে—ফুটতে ফোটে না। চালই রয়েছে এখনও।

সানাইদারের পেট জ্বলছে। কাল রাতে খেয়েছে চাট্টি ভাত, তারপর এই সাত কোশ পথ ঠেঙিয়ে এসে আঁতকত্তালে হয়ে গেছে। বলে ওঠে :

—চাল চালই সই। নামাও দিকি, প্যাটে যেয়ে সেদ্ধ হবে। আর তরকারি ওই আলুসেদ্দ।

বেন্দা বায়েন রসিকতা করে :

—মরি মরি ! যেমন দল এক ঢোল এক কাঁসি—আর তেমনি খাওয়া এক ভাত এক আলুসেদ্দ। ভ্যালা মন ভাই রে—দল যা হোক! একবার বাকী পাওনা হাতে পেলে দেখি দলে থাকে কোন্ সম্বন্ধী !

দোয়ারকি বলরাম বলে—তালেই হয়েছে। বাকী পয়সা পাবি! খেতে পাস কিনা তাই দেখ এবার।

কানিকুড়ো ইতিমধ্যে পাতা ধুয়ে পেতেছে, খিদে লেগেছে তারও।

ওদের কথাগুলো কানে আসে পুরন্দরের। কিছু জবাব দেবার নেই। চুপ করে বসে আছে পুরন্দর।

ওরা তাকে ওই রাঁধা ভাতের ভাগ দিতে নারাজ। আহারে তার রুচিও নেই। সব কেমন বিস্বাদ ঠেকে।

কম্বল থেকে মুখ বের করে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

জ্বরটা ছাড়ছে। সারা শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে ঝরছে গা বেয়ে। প্রাণশক্তিও কেমন ফুরিয়ে আসছে।

রোদঢাকা ধুলোমাখা পথটা দূর গ্রামের দিক থেকে চলে এসেছে। অনেক দিনের চেনা এ-পথ।

এ-পথে বহুবার সে এসেছে গেছে। তরুণ বয়সের বিজয়ী পুরন্দরের পায়ের ছাপ আজ মুছে গেছে ও পথ থেকে। আজ চলেছে সেই পুরন্দর ওই পথেই, তবে মাথা উঁচু করে নয়, নীচু করে।

ওই দীর্ঘ পথটার সঙ্গে তার জীবনেরও মিল রয়ে গেছে। ওই পথের পাশে পিছনে রয়েছে কোন শান্ত সবুজ গ্রাম। কত ঘরের স্বপ্ন। ওর বুকে সেখানে ফুটে উঠেছে নবশিশুদলের কলকাকলি—কোন শস্যসম্পদভরা ঘর, মানুষের বসত।

সব ছেড়ে ওই পথটা আবার বের হয়ে এসেছে রিক্ত প্রান্তরে। এখানে ওর বুকে কাঁপে লি লি রোদ—হাজারো শিখায়। ধুলিঝড় ওঠে—জীবনের যত সুখ-দুঃখ আর অশ্রু-আনন্দের দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে।

একদিন, কবে ওর বুক বেয়ে বের হয়েছিল কয়েকটি তরুণ দিগ্বিজয়ে—এই মারুটের দিঘি, ওই ক্ষেত-প্রান্তর তাদের চোখে জয় আর আনন্দের নেশা এনেছিল সেদিন।

প্রথম বের হয়েছিল ওরা দইদে বৈরাগীতলার দিকে।

সে আজ কত বৎসর আগে, ঠিক মনে করতে পারে না।

তারপর কত দিন, কত বৎসর, কত অশ্রু-বেদনাভরা ইতিহাস পেছনে পড়ে রয়েছে কে জানে!

তবু সেই দিনগুলো আজও মনে পড়ে।

আবছা স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে জীবনের কয়েকটা দিন আজও অক্ষয় হয়ে আছে।

এই বটগাছটা তখন অনেক ছোট।

লোকে বলত চারা বটতলা। আজ সেই বটগাছ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। অনেক কালের সাক্ষী ও।

জীবনের পথ-পরিক্রমায় বহুবার এই বটতলায় এসেছিল পুরন্দর, বসেছে, জিরিয়ে আবার পথ চলেছে।

সেদিনের জীবনটা, সেই দিনগুলো—আর আজকের রিক্ত দিন, ব্যর্থ জীবন কেমন পাশাপাশি মনে পড়ে পুরন্দরের। সেদিন ছিল আনন্দ আর সার্থকতা! আর আজ—!

ন্যাড়া, রামপদ, গোকুল আর ঢোল-সানাইওয়ালা সেদিনও ছিল সঙ্গে। বাঁধনদার আজাহার পট খেলানো ছেড়ে ওর দলে ভিড়েছে।

যেমনি আজাহারের সুরেলা গলা, আর তেমনি কাজের লোকও সে। এতদিন ঘরে ঘরে পট খেলিয়ে আর মন্দিরা বাজিয়ে গান করেছে, বিনিময়ে যে যা দিয়েছে তাই নিয়েছে তার ঝুলিতে, সে তো ভিক্ষারই নামান্তর মাত্র।

আর শ্রোতা দর্শক বলতে গাঁয়ের ঘরের বৌ-ঝি-গিন্নীরা।

গ্রামের সেই ছোট গণ্ডি থেকে আজাহাব বের হয়ে এসেছে

পুতুলনাচের দলে। আরও বড় পালা—আরও অনেক দর্শক এখানে। পয়সাও তার তুলনায় বেশী পায়, সম্মান-খাতিরও করে অনেকে।

নিজের বিদ্যাবুদ্ধি আর গান দিয়ে পুরন্দরের দল আজ দাঁড়িয়ে গেছে।

মেলায় তার দলের নামে দর্শক ভিড় করে। তাই কর্তৃপক্ষ টাকা দিয়েই নিয়ে যায় ওদের।

পুরন্দরের পুতুল যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পাল্লা লাগে মেলার আসরে।

একদিকে মানুষের যাত্রা, অন্যদিকে পুতুলের পালাযাত্রা গান। আর ওপাশে কবি কিংবা তরজার আসর।

পুরন্দরের চোখের সামনে সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো ফুটে ওঠে। একালের অতৃপ্তি আর অভাবের নগ্নতা রুক্ষতা ছাড়িয়ে প্রাচুর্যভরা সবুজ প্রশান্তির মাঝে গৌরবের দিনে ফিরে গেছে সে।

মনে একটা আনন্দ। চলেছে তারা ভাগ্য-অন্বেষণে।

সন্ধ্যা নাগাত ন্যাড়া, পুরন্দর, আর সবাই সেবার মেলায় পৌঁছেছে। সবে জমছে মেলা। লোকজন, দোকানপসার অনেক এসেছে।

এক বিরাট মেলা।

রাঢ়ের দুর্গম অঞ্চলে বৎসরের অন্য সময় যাতায়াতের পথ নেই। বর্ষায় ওই বাদশাহী সড়ক ভেসে যায় জলের তোড়ে, নদী কাঁদর ছাপিয়ে বন্যা ওঠে। শীতকালে তবু গরুর গাড়ি চলে মেঠোপথে।

দূর-দূরান্তরের শহর থেকে আসে দোকানপত্র, এক এক রকম দোকানের সারি এক এক দিকে।

দোকানের সারি। বাসন তো বাসনই চলেছে। মাদুর-শীতলপাটি তো তাই। লোহার কড়াই, টুকিটাকি, শিল-যাঁতা তো তারই দোকান চলল সারবন্দী। তারপর মনিহারী—খাবারের দোকান—এটা-সেটা তো আছেই।

ওদের জন্য আগে থেকেই টিন-চট-সরপাতা দিয়ে ঘর তৈরি হয়। তদারক করে মেলা-কর্তৃপক্ষ।

আমবাগানের সীমানা ছাড়িয়ে বিশাল ধান-মাঠের শূন্য বুক ভরে যায়—সারা মাঠ ক'দিনের জন্য শহরে পরিণত হয়। আলো, রোশনী আর লোকজনের কোলাহল ওঠে। যাত্রা-কবিয়ালের ভিড় জমে। বাহবা শিরোপাও পায় তারা।

কেমন যেন গমগম করে ঠাঁইটা। সম্মিলিত আলোকসমষ্টি রাতের আঁধারে আকাশ ছোঁয়—তারাগুলোও এখানে ম্লান, মিনমিনে।

মাঠের নিস্তব্ধ পরিবেশ বাজির বাজনা আর কলরবে ভরে ওঠে।

ন্যাড়া, রামপদ, আজাহার—এদের নিয়ে পুরন্দর যখন এসে পৌঁছল, তখন মেলার রাতের যৌবন শুরু হয়েছে।

এত বড় মেলায় এর আগে আসেনি—দেখেনি তারা।

নামই শুনেছে। এই ভিড় আর এত লোকের মাঝে যেন হারিয়ে যাবে ওরা।

পুরন্দর একটু ঘাবড়ে গেছে। এই জনসমুদ্রে হাজারো আনন্দের মাঝে কে তাদের পুতুলনাচ দেখতে আসবে, তারিফ করবে!

যদি সুবিধা না করতে পারে, বেশ জানে পুরন্দর, তাকে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।

বাড়িতে বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে।

অভাব আর অভাবের ছায়াটা আঁধার হয়ে মনে নামে। কি করবে এই বিশাল মেলায়, তাই ভাবছে পুরন্দর।

আজাহার চমকে ওঠে :

—উরে বান্ তানাস্ রে! ই কতি এলাম গো! হারিয়ে যাবো নাকি, এ্যা!

ন্যাড়া ওদের মধ্যে একটু বোলবোলওয়ালা। সে বলে—ঘাবড়ো না গায়েন, ইখানে গান গেয়ে নাচ দেখিয়ে নাম করতে পারলেই ব্যস্, এ চাকলা জয় হয়ে যাবে। একবারে রাজ্য-জয়।

পুরন্দর তাই ভাবছে। এখানে হারিয়ে যেতে আসেনি সে। জয় করতে এসেছে।

এই মেলার এত লোকের সামনে সে এসেছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। ছেলেবেলায় ওর ঘরে একটা পট থাকতো—সেটা আজও আছে। ভক্তিভরে সেটাকে মনে মনে প্রণাম করে পুরো।

মা সরস্বতীর পট। সর্বনাট্যের সর্বস্বষ্টির মূল কর্ত্রী। মনে মনে তাঁকেই প্রণাম করে এই মাটি মাথায় নেয় পুরন্দর। বলে ওঠে:

—রাতটা কাটাতে হবে তো, যা হয় একটা কিছু খাড়া কর। তারপর কাল সকালে ব্যবস্থা করতে হবে।

ন্যাড়াও সায় দেয়:

—হ্যাঁ, বসে বসে খেতে কুলোবে না, কাল সন্ধ্যাতেই পুতুলনাচ লাগাবো কিন্তু।

মেলার আলো, ওই কলরব আর যাত্রার দলের ফ্লুট-কর্নেটের শব্দ রাতের বাতাসকে কেমন ভারী করে রেখেছে।

শীত নেমেছে। কনকনানি শীত। কোনরকমে একটা সর-পাতা ছাওয়া খুপরিতে শুয়ে আছে তারা।

কাঁথাগুলো হিম হয়ে আসছে ঠাণ্ডায়।

পুরন্দরের ঘুম আসে না। সামনে তার কঠিন একটি দায়িত্ব। জীবনের পরম পরীক্ষা-লগ্ন। শীতে আর চিন্তায় ঘুমোতে পারে সে।

আজ বেশ বুঝেছে, বাবা আর সংসার টানতে পারবে না। টানবে না। মায়ের সব ভার পড়েছে তার উপর। নিজের টিকে থাকার প্রশ্নও আছে এবং পথ তার সামনে এই বৃত্তিই। এ ছাড়া আর কোন পথ তার সামনে নেই।

মরণপণ সংগ্রাম করে জিততে হবে তাকে—টিকে থাকতেই হবে এই পথে। শুধু হাতে সে ফিরে যাবে না।

রাত হয়ে আসে।

ন্যাড়া মেলায় বেড়াতে গেছে। যাত্রার দলের গান হচ্ছে, ওই পথের পুরানো পথিক সে। সুতরাং ন্যাড়াকে রাখা যায়নি। সে যাত্রা শুনতেই গেছে।

—যাবো আর দুটো সিন দেখেই চলে আসবো। কি রকম গায়েন একটু দেখা দরকার।

তাই দেখছে। এখনও ফেরেনি ন্যাড়া।

আঁধার হয়ে এসেছে মেলার এদিকে। অনেক রাত্রে দোকানপসারও বন্ধ করেছে ওরা।

শোনা যায় ফ্লুট-কর্নেটের সুর, বক্তৃতার টুকরো শব্দ।

রাতের অন্ধকারে ওটা ফুটে উঠেছে। কোথায় ঢোল বাজছে, কবি-গান হচ্ছে। তারই দোয়ারকি আর ঢোলের তেহাই কানে আসে পুরন্দরের :

ন্যাড়াকে ফিরতে দেখে ওর দিকে মুখ তুলে চাইল পুরন্দর। ন্যাড়া চাদরখানা মাথা থেকে খুলতে থাকে।

আর সবাই ঘুমোচ্ছে। ন্যাড়া বলে ওঠে :

—অবিনাশ অধিকারীও এয়েছে দেখলাম পুরো।

—অবিনাশ এসেছে !

পুরন্দর একটু চমকে ওঠে। অবিনাশ অধিকারীর পুতুলনাচ এ অঞ্চলের মধ্যে নামকরা, সে-ও দেখেছে।

সেই জাঁহাবাজ জাঁদরেল অবিনাশ অধিকারীর দলের পাশাপাশি পাল্লা হবে ! বেশ চিন্তায় পড়ে পুরন্দর।

ন্যাড়া বলে :

—তুমি ঘাবড়ো না পুরোদা, দেখ না কাল নতুন পালা লাগাবো। ওই কর্ণের পালা। তার সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। তুমি শুধু চুপ করে দেখো।

ন্যাড়াকে খানিকটা বিশ্বাস করতে পারে পুরন্দর।

ওর এলেম আছে।

পরদিনই ন্যাড়া এক কাণ্ড বাধায়। সরগরম করে তোলে সারা মেলা তাদের আগমনের সংবাদে। পাঁচতোপী থেকে ইতিমধ্যে কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে এনেছিল। পুতুলনাচের নামকরণও হয়ে গেছে নানাভাবে ফলাও করে লেখানো সেই ইস্তাহারে। বাজির দলের ব্যাণ্ড আর ড্রাম ভাড়া করে সারা মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। আশপাশের গ্রামেও লোক পাঠিয়েছে। দলের আগে চলেছে ন্যাড়া। তার হাতে একটা বাঁদরের পুতুল। সেই বাঁদরটা মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়ছে, মুখ-ভেংচি কাটছে। ল্যাজটা আসমানে তুলে কাগজ ছিটোচ্ছে—সেই পুতুলনাচের হ্যাণ্ডবিল। ভিড় জমে যায় চারদিকে।

নতুন ব্যাপার দেখছে সকলে। ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা, লোকজন জুটে যায়। সকলের মনে একটা কৌতূহল জাগে এই বিজ্ঞাপনের অভিনবত্বে।

অবিনাশ অধিকারীও খবরটা পায়। তাব পাল্লাদারও জুটেছে। টহলী তেল মাখাচ্ছে অধিকারী মশাইকে। তেল-কুচকুচে কালো বিশাল দেহ, কাপড়খানা গুটিয়ে একেবারে লজ্জাবস্ত্র করা হয়েছে। ওই হ্যাণ্ডবিলখানা দেখে ঠেলে উঠল অবিনাশ অধিকারী।

তার মুখের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে ঃ

—কোন্ শালা আবার এল রে! এ যি দেখছি ছাপা কাগজ! এ্যা! অনুষ্ঠান লি—পি!

অবিনাশ কোমরের কসিটাকে বাঁধতে বাঁধতে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে যাত্রার দলের মহিষাসুরের মত বীরদর্পে।

ওর দলের কে বলে ওঠে ঃ

—নতুন দল লাগছে।

—তা তো দেখছি। কোথাকার র‍্যা এরা?

—পাঁচগাঁয়ের পুরন্দরের দল। পুরন্দর অধিকারী।

ফোঁস করে ওঠে অবিনাশ—শালা অধিকারী! র‍্যাঁদামারা হলেন অধিকারী! আরসুলা আবার পাখী!

ধপ্ করে বসে পড়ে হাসতে থাকে অবিনাশ।

পাশ গায়েন বলরাম বলে—শুনেছি নাকি লেখাপড়া জানে ছোঁড়া, আর পালাও নিজেই বানায়।

—দেখা যাবে। এ্যাই মাদারী—তেল মাখা।

ধমক খেয়ে টহলী আবার বিশাল দেহটাকে ময়দাডলা করে ডলতে থাকে।

ন্যাড়া, রামপদ আর আজাহার আজ মেতে উঠেছে।

পুরন্দর সারাদিন ধরে পুতুলগুলো ঠিক করেছে। পালাটা ঝালিয়েছে কয়েকবার।

যন্ত্রপাতি বলতে হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোল আর কাঁসি, সেই সঙ্গে সানাই।

অবিনাশের দলে বেহালা আছে। মাঝেমিশেলে যুদ্ধের সময় কর্নেট-ফুলুটও বাজে।

ওসব না থাক তার, পুরো জানে, তার পালায় একটা করুণ রস আছে। একটা মনছোঁয়া বস্তু আছে, যেটা লোককে মুগ্ধ করে। এটা অবিনাশের দলের ওই তর্জন-গর্জনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না মোটেই।

এইটুকুই তার ভরসা। এই দিয়েই সে চেষ্টা করে দেখবে।

মেলা-কর্তৃপক্ষও ছেলেমানুষের দল দেখে একটু সহানুভূতিই দেখায় ওদের।

অবিনাশের বড় দেমাক। এ মেলায় আসতে অবিনাশ আগাম নিয়েছে তিনশো টাকা—তারপর রাত-ফুরোন তো আছেই। একাই সে এ মুলুকে রাজত্ব করছে। তার জুড়ি একজন থাকা দরকার।

দাসকল গ্রামের ধানকল-মালিক ভূপতি কুণ্ডু বলেন পুরন্দরকে দেখে-শুনে ঃ

—বেশ, শুরু করো তোমরা। তবে মেলার মান-ইজ্জৎটা যেন থাকে।

ক্রমশঃ পরিচয়টা বের হয়। কুণ্ডুমশাই প্রশ্ন করেন ঃ

—সদাশিবপুরে তুমিই পুতুলনাচ দেখাতে গিইছিলে ?

—আজ্ঞে। পুরন্দর ঘাড় নাড়ে বিনয়ের সঙ্গে।

—বিশু মোড়ল আমার আপন সম্বন্ধী। তাহলে তো আমার স্ত্রীকে চেনো হে! বটে বটে—কি যেন নাম বলছিলে—পুরো—না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম পুরন্দর সূত্রধর।

ভূপতি কুণ্ডু রসিক অর্থবান লোক। প্রথম থেকেই ছেলেটিকে দেখে ভাল লেগেছিল। মার্জিত, ভদ্র এবং বিনয়ী। এ পথে যারা আছে, এ তাদের গোত্রের নয়।

ওর প্রশংসাও শুনেছেন নিজের বোনের কাছে।

আজ তাঁর কাছেই এসেছে ওরা মেলায় যাবার জন্য বলতে। কুণ্ডুমশাই ওর কথায় খুশী হয়েছেন—বাঃ, বেশ পদবী, সূত্রধর! বেশ বলেছ হে! পুতুলের সূত্র ধরে থাকো, তাই পদবীর সঙ্গে পেশাটাও মিলেছে ভাল। সূত্রধর!

ন্যাড়া জোড়হাত করে আমন্ত্রণ জানায়:

—আজ্ঞে, আজ সন্ধ্যেয় তালে পায়ের ধুলো দিতে হবে। পেথম পালা ধরবো। দু'চারজন সজ্জন ব্যক্তি থাকেন তো ভরসা পাই। আশীর্বাদ করুন আমাদের, পুত্রতুল্য আমরা।

ন্যাড়া যাত্রাদলের ভঙ্গিতে একেবারে কুণ্ডুমশায়ের পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে দিল। খুশী হন কুণ্ডুমশাই—বেশ! বেশ! যাবো।

তিনি স্বয়ং মেলা-কমিটির সেক্রেটারি, সাঙ্গোপাঙ্গরাও কেউকেটা। সুতরাং এরপর চট, তেরপল, দুটো লাইট জুটতে দেরি হল না। স্টেজও তৈরি হয়ে গেছে। কয়েকটা বড় গ্যাস-আলোয় কাঁচের ড্রুম দিয়ে রাংতা মুড়ে নানা রঙের ফোকাসের মত ব্যবস্থা করেছে ন্যাড়া সারাদিন তোড়জোড়ের পর।

পুরন্দর দেখে-শুনে অবাক হয়:

—করেছিস কিরে! এ যে বাবুদের বাড়ির থিয়েটারের স্টেজ বানিয়েছিস!

হাসে ন্যাড়া:

—যে পুজোর যে মন্তর। হাজার লোকের সামনে আজ খেলা

দেখাবো, হয় উত্থান, না হয় পতন। বুঝলা পুরোদা! তাই তোড়-জোড়ের বাদবাকী রাখিনি।

পুরন্দর তা জানে।

ন্যাড়া বলে—অবিনাশও আসবে খেলা দেখতে কে বলছিল। বিজায় ভয়ও পেয়েছে শোনলাম।

পুরন্দর আজও ভোলেনি সেই কয়েক বৎসর আগেকার ঘটনাটা। তাকে দূর করে দিয়েছিল বিশ্রী রসিকতা করে। তবু মানী লোক। তার সঙ্গে এ ছাড়া বিবাদ কিছুই নেই। জিজ্ঞাসা করে পুরো:

—ভয় পেল কেন রে?

—আর কেনে! গদাগদ লাথি মারছে একে ওকে, টহলীকে। ভাতে হাত পড়েছে কাঁড়াদাস বাবাজীর কিনা!

কথা কইল না পুরন্দর। একবার সব দেখে-শুনে নিয়ে দুরুদুরু-বুকে প্রতীক্ষা করছে।

সন্ধ্যার আলো জ্বলে ওঠে মেলায় একটার পর একটা।

অন্ধকার হেরে পালিয়ে গেল।

লোকজন আসছে, ভিড় জমছে কাতারে কাতারে।

ন্যাড়া কোত্থেকে দুটো কলাগাছ এনে ঢোকবার পথের দু'পাশে পুঁতেছে, বসিয়েছে মাটির ঘট; আর মাচানে সানাইদার তবলাওয়ালাকে তুলে নহবৎ বসাবার চেষ্টা করেছে। এসব পরিকল্পনাই নতুন।

সামনের দিকে কিছু আলাদাভাবে বসবার জায়গা করে রেখেছে। কানাত ভর্তি হয়ে গেছে। তবুও সিটগুলো ছাড়েনি তারা। লোকজন টিকিট না পেয়ে বাইরে ভিড় করেছে, অবাক হয়ে তারা ওই আলো, সানাইয়ের মাচান, আর সাজানো মণ্ডপের দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। এ সবই নতুন ঠেকে।

লোকজন সাধারণতঃ যা দেখে থাকে—এ তা নয়। তার থেকে আলাদা। ন্যাড়া হাতজোড় করে অভ্যর্থনা জানায় সবাইকে। কুণ্ডু-মশাই, কীর্ণাহারের বিনোদ ডাক্তার, জুবুটের নরেন ডাক্তার—আরও

অনেকে আসেন এ অঞ্চলের গণ্যমাণ্য লোক। কুণ্ডুমশাই খুব খুশী দেখে-শুনে।

—বাঃ, বেশ করেছ তো হে!

পরিবেশ দেখে ভালোই লাগে। আলাদা জায়গায় বসলেন তাঁরা।

চারিদিকে চট ঘিরে খানিকটা অন্ধকার করা হয়েছে। স্টেজে তখনও পর্দা নামানো। লোকজন মেয়েছেলের ভিড়ে দেখতে দেখতে সব ঠাঁই ভরে ওঠে।

পুতুলনাচের স্টেজ এর আগে অবিনাশও করেনি, এমনি একটু জায়গা ঘিরে চারপাশে আড়াল করে খোলা মাঠেই খেলা দেখায় তারা। অনেকখানি মাধুর্য হারিয়ে যায় তাতে।

পুরন্দরের পালা শুরু হয়েছে। কর্ণার্জুন।

নিয়তির গান শোনা যায়। আজাহার মিঠে গলায় গেয়ে চলেছে—

আমি কখন ভাঙি কখন গড়ি
নাহিক ঠিকানা
ললাটপটের কালের লিখা
চিরদেখা করে রয়েছি গো একা।

কর্ণের প্রবেশ হল মঞ্চে। ধীর সংযত-চরিত্র—সুন্দর পুরুষ। অন্তরালে এসেছে শকুনি, কুটিল ধূর্ত একটি শয়তান। পুতুলগুলো আলোয় আর নড়াচড়ায় জীবন্ত মনে হয়।

মুগ্ধ জনতা নতুন কি এক বিষয়বস্তুর স্বাদ পায়।

ন্যাড়া নিপুণভাবে আলোগুলো নাড়াচাড়া করছে। কখনও দু'চারটে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সিনে মাত্র দু'তিনটি আলো রেখেছে, আর জোরালো গ্যাসের আলোটাকে রাংতামোড়া টিনের পাশ থেকে ফেলেছে দ্রৌপদীর উপর। আলোছায়ার মায়া ফুটে ওঠে।

কাপড়খানা টেনে চলেছে দুঃশাসন।

আজাহার দ্রৌপদীর পার্ট বলে চলেছে—করুণ মিষ্টি আর্ত সুর—ক্রমশঃ চড়ায় দ্রুতলয়ে উঠছে। আলোটার সামনে লাল নীল-কাগজ দিয়ে মুহুর্মুহু আলোর রং বদলাচ্ছে।

একটি অখণ্ড মুহূর্ত—অমনি বিস্ময় ক্রোধ আর কান্না মেশা।

চড়চড় শব্দে হাততালি পড়ে।

সমবেত জনতার মুখে প্রশংসা আর আনন্দের ছায়া। ওরা এ জিনিস আগে দেখেনি, পুতুলনাচ আর থিয়েটার দুটো একত্রে যেন গেঁথে ফেলেছে ওরা।

ওদের করতালির শব্দ ওঠে।

একটি লোক এই সব দেখে-শুনে রাগে জ্বলছে। অসহায় রাগ।

ভিড়ের মধ্যে একপাশে বসেছিল অবিনাশ অধিকারী। রেগে উঠে চলে গেল। এই আনন্দ-কোলাহল, প্রশংসা-অভিনন্দন প্রথম রাতের পালাতেই সে পায়নি। প্রথম রাতে কেন, এখনও সে পায়নি। তার পালায় আছে অন্য কথা। এর সুরে মেলে না।

মেলায় আর কিছু দেখবার নেই বলে লোক তার পুতুলনাচ দেখতো, বেশ বুঝেছে এবার তার সমূহ বিপদ। ওই সাবেকী পুতুলনাচ দেখতে যাবে না অনেকেই।

ভূপতি কুণ্ডু, বিনোদ ডাক্তার সকলেই আজ সপরিবারে এখানে এসেছেন। ভালো লেগেছে তাঁদের। বসে থাকে অবিনাশ, গজগজ করে।

তার কাছে এই কাণ্ডকারখানা অত্যন্ত বাজে বলে মনে হয়, সমস্ত।

তার দলের মত ষোলকুশী তান—মালসীর গান এরা জানে?—ধ্যাৎ! কেবল আলো, পুতুল আর একটো!

গজগজ করে বের হয়ে গেল অবিনাশ। লোক দুচার জন তাকে দেখছিল, পিছন থেকে কে মন্তব্য করেঃ ভীমসেন যে পালিয়ে গেল র‍্যা! দুঃশাসনের রক্তপান হবে না?

কে জবাব দেয় : ধ্যাৎ, ও জ্যান্ত ভীম। এখন পুতুলনাচ দেখ।

একরাত্রের প্রথম খেলাতেই পুরন্দর মুগ্ধ করেছে, চমৎকৃত করেছে দর্শকদের। মেলা-কর্তৃপক্ষ খুব খুশী।

পুতুলনাচ যে এমন প্রাণবন্ত এবং সুন্দর রসগ্রাহী হতে পারে, তা জানা ছিল না। যাত্রা এবং পুতুলনাচকে একেবারে থিয়েটারের ঢঙে নিয়ে এসেছে পুরন্দর।

বিনোদ ডাক্তার বলে ওঠেন—এসব তোমার লেখা? এই পালা?

পুরন্দর বলে—থিয়েটারের বই থেকে কেটে-ছেঁটে নিয়েছি নিজেদের মত করে।

ওঁর পকেটের দামী কলমটাই ওর হাতে দেন বিনোদ ডাক্তার। বলেন :

—এইটে রাখো। নতুন পালা লিখবে এই দিয়ে। আমাকে দেখাতে হবে কিন্তু সে পালা।

পুরন্দর মাথা নুইয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটির পায়ের ধুলো নেয়। এ যেন তার সবথেকে বড় পাওয়া।

কলরব কোলাহল জয়ধ্বনি করে চলেছে অগণিত সাধারণ দর্শকের দল। দূরদূরান্তর থেকে এই শীতে এসেছে মেয়েছেলে নিয়ে তারা। মুক্ত আকাশের নীচে বসে থাকে ওরা, মাঝে মাঝে তামাক খায়, বিড়ি টানে, আর দু'চোখ মেলে নাচ দেখে। অল্পতেই খুশী ওরা। মন ছুঁলেই ওরা কৃতজ্ঞ।

ভালো লাগলেই উচ্ছ্বসিত আনন্দে হরিধ্বনি দিয়ে ওঠে। সংবর্ধনা জানায় মূল সূত্রধরকে—পুতুলনাট্যের সূত্রধর ওই পুরন্দরকে।

পালা ভাঙার পর তাদের অনেকেই এখনও রয়ে গেছে। এদিক ওদিক দেখছে। মুখে মুখে তাদের আজকের পালার আলোচনা।

আবার দেখতে আসবে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে।

কুণ্ডুমশায়ও খুশী হয়েছেন, অবাক হয়েছেন এদের কারসাজি আর পালা দেখে। দর্শকদের অনেকেই ওঁকে চেনে।

তাই ভিড় করে শুধোয়—কাল কি পালা হবে, ও কুণ্ডুমশাই ?

ভূপতি কুণ্ডুই সেদিন এদের তরফ থেকে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন—কালকের পালা তরণীসেনবধ।

রাত হয়ে গেছে।

ন্যাড়া, আজাহার, রামপদ—ওরা সকলেই পুতুলগুলো গুছিয়ে বাক্সবন্দী করছে। যন্ত্রপাতি দড়িদড়া খুলছে। একটা সাজের বাক্সর উপর বসে আছে পুরন্দর।

তিন ঘণ্টা ওই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে হাঁপিয়ে উঠেছে। তারপর আজকের ওই সংবর্ধনা খ্যাতির ধাক্কাটাও কেমন তাকে চমকে দিয়েছে। একটু বিশ্রাম চায় দেহ-মন। বলে ওঠে পুরন্দর ঃ

—তোরা গুছিয়ে-টুছিয়ে আয়। আমি চললাম।

ন্যাড়া সায় দেয় ঃ

—তাই যাও। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় গে। কাল আবার লড়তে হবে। বলেছিলাম না পুরোদা, সব ট্যারা করে দোব। কাল দেখো আবার কি করি। আজাহার রে, সোনায় মুড়ে দোব বাপ তোর গলা—আর অধিকারীর আমার সব্বাঙ্গ !

রামপদ বলে ওঠে ঃ

—অবিনাশ অধিকারীর দৌড় যদি দেখতিস। খুব টোস্ খেয়ে গেছে যাহোক।

পুরন্দরের ওসব কথা ভাল্লো লাগে না। জানে গাড়ির চাকার তলা উপর আছে। নইলে চলতেই পারবে না। যেমন গাড়ির ওপর নৌকা ওঠে—আবার সময় বিশেষে নৌকার ওপরও গাড়ি চড়ে। আজ অবিনাশের বয়স হয়েছে। তারও এমনি দিন আসতে পারে।

তাই খুশী হতে পারে না ওসব আলোচনায়।

চুপ করে বের হয়ে আসে পুরন্দর।

এই জয় আনন্দের দিনে একজনকে বার বার মনে পড়ে। আজ সে কোথায় কতদূরে কে জানে? ললিতাকে ভোলে নি।

মেলার কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসছে। ঝাঁপ বন্ধ করে দোকানদাররা শোবার আয়োজন করছে। কানে আসে ওর পুতুলনাচেরই কথা। কারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। পুরন্দরের এ-সব যেন ভালো লাগে না।

পুরন্দর খেয়াল করেনি, আপন মনে চলেছে বাসার দিকে। কালকের পালার কথা ভাবছে, কোথায় নতুন কাজ করা যায়।

এ তার বহুদিনের পালা। অনেকবার করেছে। জানে ওই করুণ দৃশ্যগুলোতে অনেকের চোখে জল আসে।

ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে একটু-আধটু আলো, সেই আলো-আঁধারির মাঝ দিয়ে চলেছে পুরন্দর।

হঠাৎ সামনের একটা আমগাছের নীচে কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এগিয়ে আসছে মূর্তিটা। শাড়িপরা একটা মেয়েমানুষই।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে পুরন্দর। চেনা কণ্ঠস্বর তাকে ডাকছে।

—পুরো!

থামল পুরন্দর। নির্জন অন্ধকার তারাজ্বলা রাতে, হিম কুয়াশার আবছা আবরণ ভেদ করে বিস্মৃতি আর হারানোর আঁধার থেকে এগিয়ে আসছে ললিতা। তার হারানো ললিতা।

—তুই! এখানে!

চমকে উঠেছে পুরন্দর। অজান্তেই সে-ও কয়েক পা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। ললিতা বলে চলেছে:

—এসেছি এই মেলায়। তুমি তো চলে গেলে, তারপর—কেমন কথা বলতে পারে না ললিতা।

থেমে গেল। কান্না যেন জমাট বেঁধে আছে ওর কণ্ঠস্বরে। চুপ করল সে। ও কথা বলতে পারে না।

—তারপর ? পুরন্দর জানতে চায় ওর সব কথা। সব দুঃখ আর চরম অপমানের কাহিনী।

আজ ললিতার সব গেছে। কোন পার্থক্য নেই কাদম্বিনী—ওই বাসিনী—আরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু কি করে জানাবে পুরন্দরকে তার সেই অপমানের কাহিনী। ললিতা চেপে যায় সে কথা। বলে ওঠে সহজভাবেই :

—ওসব থাক। তুমি ভালো আছ ?

—হ্যাঁ।

ললিতার দিকে চেয়ে থাকে পুরন্দর। তারা জ্বলছে। আশেপাশে অন্ধকার, কুয়াশার ঘন আবরণে একটু দূরেই আর নজর চলে না।

ওকে দেখছে। ক'মাসের মধ্যেই ললিতা কেমন পুরুষ্ট সুন্দর হয়ে উঠেছে। চোখের তারায় উজ্জ্বল একটি আভা।

ললিতা খুশিতে আজ ফেটে পড়ে। মাসীর ওই মহল্লা থেকে আজ। পালিয়ে এসেছে পুতুলনাচ দেখতে। খবর ওবেলাতেই পেয়েছিল ওরা সেই থেকে ললিতা আসবার সুযোগ করে নিয়েছে।

ন্যাড়ার প্রচার সত্যিই কাজের হয়েছে। তাই ললিতাদের ওই অন্ধকার বাগানের ঝুপড়ি ওই নবকপুরী থেকেও অনেকে এসেছিল পুতুলনাচ দেখতে।

তারা ফিরে গেছে। ফেরেনি ললিতা—সে পথ চেয়ে ছিল আশপাশে ওরই অপেক্ষায় এই আঁধারে।

বের হবে পুরন্দর। এতক্ষণ ব্যাকুলভাবে তারই পিছু পিছু এসেছে একটু নির্জনে দেখা করতে। উচ্ছলকণ্ঠে বলে ওঠে ললিতা :

—খুব ভালো লাগল তোমার পালা। শোনলাম, খুব নামডাকও হয়েছে। মস্ত লোক হবে তুমি।

ললিতা যেন দূরে দাঁড়িয়ে কোন অপরিচিতকে প্রশংসা আর স্তুতি জানাচ্ছে। এই খ্যাতি-প্রশংসায় ওর কোন ভাগ নেই।

নিজেকে ওর অজ্ঞাতেই আজ পুরন্দরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। ললিতা আজ দূরের মানুষ।

কথার জবাব দিল না পুরন্দর। আজ মনে হয়, ললিতার যেন চাপা একটা অভিমান রয়ে গেছে। থাকবারই কথা।

পুরন্দরকে এই পথে এগিয়ে যেতে সে-ও কম সাহায্য করেনি। আজ তার এ কৃতিত্ব যশ খ্যাতিতে ললিতার দানও কম নয়। বলে ওঠে পুরন্দর—তোকে গাঁয়ে ফিরে অনেক খুঁজেছি ললিতা। সেদিন তুই চলে এসেছিস!

ললিতার খুশির প্রকাশ থেকে মনের অতলে একটি সুর জাগে। সবভোলানো নিবিড় ভালোলাগা একটি সুর। পথ খুঁজে ঘর খুঁজে ফেরে যে চিরন্তন নারীমন, একজনকে অবলম্বন করে যে নারী বাঁচতে চায়, মাঝে মাঝে সেই সত্তা ব্যাকুল বুভুক্ষায় জেগে ওঠে ললিতার মনে। ফিসফিসিয়ে ওঠে ললিতা ঃ

—খুঁজেছিলে? আমাকে?

পুরন্দর আজ সব কথাই জানাতে চায়।

—হ্যাঁ। তোকে ছাড়া মন আর কাউকে চেনেনি ললিতা। সারা গ্রামে মন টেঁকেনি। তাই পালিয়ে এসেছি—তোরই খোঁজে মেলায় মেলায় ঘুরেছি।

ললিতার হাতখানা হাতে তুলে নেয় পুরন্দর। কেমন থরথরিয়ে কাঁপছে ললিতা। দু'চোখ ছেয়ে জল আসে।

—কোথায় আছিস?

ললিতা পাড়াটার নাম করতে পারে না। পরিচয় দিতেও কেমন বাধে। আঙুল দিয়ে আঁধারের মধ্যে দেখায়।

—বাগানের ওই পাশে। খালের ধারে।

—কাল আসবি তো? ভালো পালা গাইব। তোর রামায়ণ—সেই যে দিয়েছিলি—তার থেকে পালা বেঁধেছি।

ললিতা ওকে দেখছে। কেমন সুন্দর একটি পুরুষ।

গ্রামের মাটির সবুজ আর গাছগাছালির হলুদ মেশানো নেশা লাগে।

—ললিতা!

ললিতা জানে এই ব্যাকুলতার স্বাদ।

রাত নামে। ললিতার সারা মনে একটা নতুন সুর জাগে। ওর সামান্য স্পর্শ তাকে যেন সঞ্জীবিত করে তুলেছে। আশ্বাস এনেছে নতুন করে বাঁচবার।

—পুরো, রাত হয়ে গেছে। যাই!

—কাল আসবি তো?

কথা দিতে পারে না ললিতা। এক দিনেই বেশ বুঝেছে, যে জীবনে সে নেমেছে, যে নরকের বিষ পান সে করেছে—তার থেকে সহজে নিষ্কৃতি তার নেই। এ জীবন, আজ ওই আনন্দময় জীবন থেকে সে অনেক দূরে। পুরন্দরের এই আহ্বানে তাই ব্যাকুলভাবে সাড়া দিতে পারে না সে।

নিস্ফল অভিমানে মন কাঁদে।

দুঃখ হয়। তাই চোখ দিয়ে জল নামে।

আঁধারেই সরে গেল।

—ললিতা!

কোন সাড়া দিল না ললিতা পুরন্দরের ডাকে।

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে কি একটা নিবিড় আতঙ্কে আর ঘৃণায়। আজ নিজেকেই নিজে ঘৃণা করে ললিতা। বিজাতীয় ঘৃণা আর ভয় ওর মনে।

থামল এসে ওদের ঝুপড়িগুলোর পাশের বাগানে। আঁধার নেমেছে গাছগাছালির নীচে, সারা মেলা নিশুতি। এখানে এখনও নরকের কীটগুলো কিলবিল করছে। বাতাসে ঝাঁঝালো দিশী মদের গন্ধ। কাদের অস্পষ্ট কণ্ঠের বিশ্রী গালাগাল কানে আসে।

ললিতা চুপ করে আঁধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওখানে ফিরে যেতে মন চায় না।

চোখের সামনে তখনও পুতুলনাচের সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়ে। আলো আর রঙীন আলো-ভরা জগৎ। সুরটা ভেসে ওঠে—

ললাটপটের কালো লিখা
চির অদেখা করে,
চলেছি গো একা।

এই তারও অদৃষ্টের লিখন। ললিতার মনে হয় এই নরকবাস তাকে করতে হবে—এই বিধাতার বিধান।

জীবনের কোন পাওয়া কোন তৃপ্তিতে তার অধিকার নেই। কান্না আসে। হু হু কান্না। আজ মনে হয় তার দুঃখের সীমা নেই।

রাতের বাতাস বাগানের গাছে পাতায় হাহাকার তোলে—কোথায় মাথা তুলে আছে একটা ঝাউগাছ, বাতাস শুধু সেখানে গুমরে কাঁদছে। আর কাঁদছে ললিতা।

হঠাৎ কে যেন তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে।

—ফিরে এয়েছে গো!

—এই যে! অ মাসী!

চিৎকার শুনে মাসীও অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসে।

সন্ধ্যা থেকে ললিতা পালিয়েছে। রোজগারের মরশুম—মাঝে মাঝে ছুঁড়িটার মাথা বিগড়ে যায়। বেবশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বাগ মানে না। সেদিন আর গানের আসরে কিছুতেই যাবে না। রোজগার বন্ধ করে দেয়।

ভাবনায় পড়েছিল মাসী, তার ভবিষ্যতের ভাতঘর। মেয়েটা কোথাও কার সঙ্গে পালালো কিনা কে জানে। এদলে-ওদলে অমন মেয়েকে ভাঙাবার, ফুসলাবার লোকের অভাব হবে না। তেমনি কোন ঠগের পাল্লায় পড়ল কিনা কে জানে! অন্য দলে গেলে আর এখানে ফিরে না আসতেও পারে।

সন্ধ্যা থেকে খুঁজছে তাই ব্যাকুল হয়ে। মাসী কেন, দলের সবাই ভাবনায় পড়েছিল ওর জন্যে। সারা মেলা দেখেছে, খুঁজেছে, তবু পাত্তা

পায়নি ললিতার। হঠাৎ তাকে আপনা হতেই ফিরে আসতে দেখে তারা নিশ্চিন্ত হয়। এবার মাসীও ছেড়ে কথা কয় না।

হঠাৎ দেখা পেয়ে রাগে ফেটে পড়ে। দলের রক্ষক এবং নেতা পাঁচু ধমকে ওঠে :

—কোথা গিইছিলি, এ্যা ?

মাসী ওর চুলের মুঠিটাই ধরে খপ করে। ঝাঁকানি দিতে থাকে। বলে ওঠে—বল গিইছিলি কোন্ চুলোয় ! নষ্টামির জায়গা পাস্‌নি এটা !

চুপ করে থাকে ললিতা।

কাঁদছে। যন্ত্রণায় আঘাতে আর অপমানে। মাসী চিৎকার করে :

—বোবা হয়ে গেলি নাকি ? বাক্যি হরে গেল ?

সাড়া দেয় না ললিতা। জীবনের অমূল্য সম্পদ আর ওই মধুর স্পর্শটুকু একান্ত তারই। আজ সন্ধ্যার কথা কাউকে বলবে না সে।

পাঁচুই মায়া দেখায়।

—ছেড়ে দাও মাসী। খামোকাই আর ওসব করো না।

মাসী ধমকায় :

—কোথাও যাবি না। বেরুবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব।

পাঁচু বলে—যেতে দাও, ছেলেমানুষ !

পাঁচুই তাকে যেন এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিল।

মাসী তখনও গজগজ করে। আজ সারা সন্ধ্যায় অনেক লোকসান হয়ে গেছে। আসর জমেনি একেবারেই।

মাসী মেলায় এসে বদলে গেছে। বাড়ির সেই মানুষ এ নয়।

কঠিন রুক্ষ কঠোর একটি মানুষ।

শুধু বেঁচে থাকার জন্য—দু'মুঠো ভাত আর কাপড়ের সংস্থানের জন্য আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে মাসী।

ললিতা ওর এই নিষ্ঠুর মূর্তি দেখে শিউরে ওঠে।

এই পরিবেশে মানুষটা পরিণত হয়েছে জানোয়ারে।

তাই ওদের ওই জগৎ—ওই আলো আর সুর ; পুরন্দরের গড়া কোন পুতুলের রাজ্যের স্বপ্ন দেখে ললিতা।

স্বপ্ন দেখে পুরন্দরের সবুজ হলুদ আর প্রশান্তি ঢাকা কমনীয়তা ভরা একটি জগতের। মন কাঁদে ব্যাকুল বেদনায়। সারা মন জুড়ে সেই বেদনার ছায়া। তবু কেমন ভালো লাগে ললিতার।

চুপ করে বসে আছে পুরন্দর।

হঠাৎ আজ বহুদিনের পর বহু অন্বেষণে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। যে মানুষটি ছোট্ট একটু নিয়ে আর পেয়ে তৃপ্ত হবে, সেই মানুষটিকে পেয়েছে।

অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেছে।

সর আর তালপাতার বেড়া দেওয়া একটু আশ্রয়। রাতের বাতাস ঢোকে হাজারো ছিদ্র দিয়ে। শীতে যেন হাড় অবধি কাঁপছে।

দলের অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে চটকম্বল চাপা দিয়ে। ঘুম আসে না পুরন্দরের।

সারা মনে একটা মুখের ছায়া। সে ওই ললিতার। তাকে এখানে দেখবে ভাবতে পারেনি। কোথায় আবার আঁধারে চলে গেল সে।

চাদরটা চাপা দিয়ে বসে আছে। সবাইকে ভুলে গেছে আঁধারে। জেগে আছে নিজে তার অন্তরের নিবিড় কামনা আর বুভুক্ষা নিয়ে। ললিতা ক' মাসে অনেক বদলে গেছে ; কেমন দূরে সরে গেছে।

মনটা হু হু করে।

ললিতা কান্নাভেজা স্বরে কি বলতে চেয়েছিল।

তার মনের কথাও জানে সে।

কলরব কোলাহল করে ন্যাড়া, রামপদ, আজাহার ফিরছে। ওকে জেগে থাকতে দেখে বলে ওঠে :

—এখনও ঘুমোওনি তুমি ?

ন্যাড়া একটু অবাক হয়। ওরা খেয়ে-দেয়ে এসেছে। রুটি আর তরকারি। পুরন্দরের খিদে নেই। ন্যাড়া একটু ধমকের সুরেই বলে :

—শুয়ে পড় দিকি। কি যে এত ভাবো পুরোদা !

ন্যাড়া গজগজ করে :

—তোমার ভাবনার এত আছে কি? মাগ না ছেলে ঢেঁকি না কুলো! ঘুমোও দি'নি—কাল আবার গান আছে।

শুয়ে পড়ে সকলেই।

পুরন্দরের ঘুম আসে না। কেমন নানাকথা ভিড় করে আসে মনে। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাই দুর্বল মনে নানা কথা ভিড় করে আসে।

মাকেও মনে পড়ে।

বার বার মনে পড়ে ললিতার সেই চাহনি, কান্নাভেজা কথাগুলো। কি যেন বলতে গিয়েও পারেনি ললিতা, আঁধারে মিলিয়ে গেছে লজ্জায়।

কাউকেও বলতে পারে না একথা।

একাই তাই রাত জাগে পুরন্দর।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না।

সরের ঝাঁঝলার ফাঁক দিয়ে রাতের হু হু ঠাণ্ডা হাওয়াও আসে, আবার দিনের উত্তাপমেশা প্রথম আলোটুকুও দেহকে উষ্ণ একটি মধুর অনুভূতিতে ভরে তোলে।

ন্যাড়ার ডাকে চোখ খোলে পুরন্দব।

—চা খাবা না? চা?

চা নামক পানীয়ের তখনও প্রচলন হয়নি এত। একটা নতুন জিনিসই। ন্যাড়া একটু শৌখিন—শীতে চায়ের ব্যবস্থা সেইই করেছে পুরন্দরের জন্য; তবু শরীরটা চাঙ্গা থাকবে।

কাঁচাঘুম থেকে উঠে কম্বল জড়িয়ে টিনের গেলাসে চা-টা মন্দ লাগে না। বেশ গরম তার স্বাদ। পুরন্দরের বেশ লাগে।

সারা শরীরের গ্লানি কেটে আসে

রামপদ গেলাসে ফুঁ দিয়ে চলেছে আর কোঁৎ কোঁৎ করে এক এক ঢোঁক গিলছে হাপুসহুপুস করে।

গরম চা খাওয়া বিশেষ অভ্যাস নেই তার, তবু একটু শখ করেই খাচ্ছে বেসামাল অবস্থায়।

ন্যাড়া বলে ওঠে—আস্তে খা, উপ্‌জ্বলন্ত চা খেয়ে কি প্যাট পুড়ে মরবি!

রামপদ বলে—বেশ যা হোক চা। গরম খেতেই হবে। কেনে, ঠাণ্ডা খেলে কি হয় হে?

মাটিতে খড় কয়েক আঁটি পাতা, চারিদিকে সরের বেড়া—তারই মাঝে ওদের প্রাতঃকালীন চায়ের আড্ডাটি জমে উঠেছে। ন্যাড়া কি বলতে যাচ্ছিল থেমে গেল কাকে দেখে।

একটি লোককে ঢুকতে দেখে চাইল তার দিকে।

লোকটাকে চেনে না। বয়স হয়েছে। তবে এমন কিছু বেশী নয়। ন্যাড়ার ওকে যেন মুখচেনা বলে মনে হয়। লোকটা এসময় এসে পড়ে একটু অপ্রস্তুত বোধ করে।

—বসো। পুরন্দরই ওকে বসতে বলে।

বসল লোকটা। শীতে গায়ে দেবার বিশেষ কিছু নেই। একটা ছেঁড়া ফতুয়া আর একটা সুতার চাদর চাপানো গায়ে, তাও ময়লা আর ঠাঁই ঠাঁই ছেঁড়া। কাপড়খানার হালও তেমনি।

মাঠে ঘাটে হেঁটে আর তেল অভাবে পা দুটো শীতের হাওয়ায় মেঠো শসার পিঠের মত দাকড়া দাকড়া হয়ে ফেটেছে। তবু অতিথি, পুরন্দর বলে ওঠে:

—চা দে রে রামপদা।

—আবার ওটা—লোকটি ইতস্ততঃ করে বিনয়ে।

—খাও। শীত কম লাগবে তবু।

লোকটা সাবধানে চুমুক দিতে থাকে।

ক্রমশঃ এই পরিবেশে একটু ধাতস্থ হয়ে কথাটা পাড়ে সে।

অবিনাশ অধিকারীর দলের পাশগায়েন—নাম বলরাম দাস। বাড়ি কাটোয়ার সন্নিকট শ্রীখণ্ডে।

অবিনাশের নাম শুনে ওরা একটু আশ্চর্য হয়। লোকটা ওর দলে এতদিন আছে। পেটে খেতে পায় আর দু'-একটা টাকা মজুরি পায় মাত্র। তাতে কি করেই বা চলে।

কিছুদিন থেকে দলও ভালো চলছে না অবিনাশের। নানা বদনাম ওর।

কাল থেকে অধিকারী নাকি ক্ষেপে গেছে প্রায়। একে ওকে গাল দিচ্ছে, ধমকাচ্ছে, শাসাচ্ছে।

তাকে বলেছে—গায়েন ভালো না হলে দল আর রাখবে না।

বলরাম তাই একটা আশা নিয়েই এসেছে এখানে।

ন্যাড়া বলে ওঠে—দল তুলে দেবে?

—না দেক। তবে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন দল করবে অন্য লোক নিয়ে। বকেয়া মাইনে দিতে হবে না তো!

বলরাম গলা নামিয়ে বলে ওঠে—দল চলবে কি করে আজ্ঞে! যি খরচ ওনার!

পুরন্দর এসম্বন্ধে কোন কথাই বলেনি, বলরামকেও কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। এক দল ছেড়ে অন্য দলে আসার মতলবটাও পুরোর খুব ভাল লাগেনি। আবার মনে ওর কথা হয়তো সত্যি; অভাবের ছায়া ওর সারা মুখে-চোখে, পোশাকে সর্বত্র। কি ভাবছে পুরন্দর। ন্যাড়াই প্রশ্ন করে বলরামকে:

—মানে?

বলরাম বলে ওঠে—পাকি মদ, আর মানে ধরুন, জলপাত্র—তার আনুষঙ্গিক ঘটা তো আর কম নয়।

—জলপাত্র! পুরন্দর মানেটা ঠিক বুঝতে পারে না।

ন্যাড়া মাথা নাড়ে—থাক থাক, ও আর বুঝে দরকার নাই পুরোদা। কি একটা ইঙ্গিত ফুটে ওঠে ন্যাড়ার কথায়।

বলরাম বলে—ওতেই সব গেছে আজ্ঞে। রোগও ধরেছেন—এইবার খসবেন।

চুপ করে শোনে পুরন্দর। এ পথের এই যেন অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাই মনে মনে শিউরে উঠেছে সে-ও।

বলরাম বলে :

—তা, চলতি দল আপনাদের, শোনলাম নতুন ছাঁদে পালা বেঁধেছেন, আর পুতুলও ভালো। যদি কাজ-কাম দেন একটা। কোনরকমে বেঁচে যাই।

পুরন্দর লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। হৃতদরিদ্র সে। তার চেয়েও অনেক বেশী প্রয়োজন ওর।

ন্যাড়া বলে ওঠে—এখন ও-দলে আছো—থাকো। হুট করে ছেড়ো না। পরে দেখা যাবে।

বলরাম কথাটা মেনে নেয়।

—আসি তাহলে ?

চলে গেছে বলরাম।

তখনও পুরন্দর চুপ করে বসে আছে। কি ভাবছে মনে মনে।

—কি এত ভাবো বল দিকিন ?

ন্যাড়া দেখেছে ওর ভাবনা। পুরন্দর কি যেন ভাবছিল। ন্যাড়া ঠিক জানে না ওর মনের কথা।

পুরন্দর ভাবছে ললিতার কথা। একটি মিষ্টি স্বপ্ন।

না, সে ভাবছে তার আগের আর একটি প্রতিষ্ঠাবান দলের অপমৃত্যুর কথা। অবিনাশ অধিকারী এ অঞ্চলের পুতুলনাচের একজন গুণী লোক। আজ দিন বদলেছে। সেই দিনবদলের স্রোতে টিকতে না পেরে যদি অবিনাশ সরে যায়—মরে যায়—

আগামী যুগের মুখে তারও মৃত্যু অনিবার্য। সে-ও ফুরিয়ে যাবে একদিন—এই কথাটাই ভাবছে পুরন্দর।

শুনেছে কলের গান—গোল চাকতিতে পিন বসিয়ে দিলেই চোং

দিয়ে গান বের হয়। এখানেও দেখেছে। শুনেছে, কলকাতায় নাকি ছায়ার বায়স্কোপও উঠেছে।

ছবিতে কত কি দেখা যায়—গান গায়, নাচে।

আরও কত কি আসবে কে জানে!

হু হু করে দিন বদলাচ্ছে। বদলাবে। পুরনো যারা আছে, তারা একে একে ঝরে যাবে ঝরাপাতার মত, নতুন আসবে তার জায়গায়।

চলতি পথ আর বহমান নদী, একই মানুষ আর একই জলধারা সেখানে দাঁড়ায় না।

চলার পথে মৃত্যুটাই সত্যি। তাই ওকে মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। যতদিন বাঁচা যায়, ভালোবাসা পাওয়া যায়—সেইটুকুই নগদ-বিদায়, লাভ।

ন্যাড়ার কথায় বলে পুরন্দর—কই, ভাবছি না তো!

—নতুন পালা দেখে শুনে নাও। ন্যাড়াই তাগাদা দেয়।

পুরন্দর আজকের ভাবনায় ফিরে আসে।

স্টেজের মাথার উপর দড়ি টাঙিয়ে আকাশের সিনে আজ উড়ন্ত পরীর দল দেখাবে সে। সেই সঙ্গে চোঙায় মুখ দিয়ে রাবণের হুংকারও শোনাবে।

পুরন্দর বাঁচবার জন্যই যেন এসব চিন্তা করছে। ন্যাড়া বলে ওঠে:

—অবিনাশ অধিকারী এবার ফৌত হবে পুরোদা! একেবারে কম্বল-গুটোনো করে দোব। ওর সেই দোহাবকিদের বেসুরো চিৎকার

বারি রে বারি রে ছায়া

বারি রে ছায়া—

আজকের দিনে অচল।

হাসে পুরন্দর—তুইও একদিন অচল হয়ে যাবি ন্যাড়া।

ন্যাড়া ওটা পরম সত্য বলে মেনে নিয়েছে।

—তার অনেক দেরি। একদিন মরবো বলে কি হাত-পা নাড়বো না আজ? চুপ করে বসে থাকবো?

ন্যাড়া গম্ভীরভাবে তত্ত্বকথা শোনাতে ছাড়ে না। দড়িগুলো খুলতে খুলতে বলে :

—রাজা রাণী, রাম সীতা—সবাইকে তো আঙুলের টানে নাচিয়ে চলেছ। তেমনি এই দুনিয়াটাকেই আর একজন নাচাচ্ছে, তা জানো তো ?

পুরন্দর হাসে—হ্যাঁ। কেন ?

ন্যাড়া বলে :

—তিনি যদি চান আর নাচবো না, ব্যস্, নাচবো না শ্যাষ হয়ে গেল সব। ওই অবিনাশ অধিকারীর দলের তাই হয়েছে, বুঝলা ? তিনি চান-না অবিনাশ আর নাচুক।

পুরন্দর চুপ করে থাকে।

এই নাচার শেষটাই পরম সত্য।

অবিনাশ এতদিন ভেবেছিল এমনিভাবেই চলবে। তাই জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে মেলা-কর্তৃপক্ষের উপর। দলের লোকদের নিঃশেষে বঞ্চিত করেছে। ঠকিয়েছে। এ অঞ্চলের লোক এতদিন তাকে শ্রদ্ধা করেছে, প্রশংসা জানিয়েছে। সেই শ্রদ্ধা আর প্রশংসার ঠেলায় সে আকাশে বেলুনের মত ফুলে উঠেছিল। আজ—।

বাতাস কমে গেছে, চুপসে গেছে বেলুন, মাটিতে নামছে। দলের লোকদের ঠকানোর স্বভাবটা আজ চরম প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেউ টাকা চাইলেই গালাগালি দেওয়া তার স্বভাব।

গর্জন করে অবিনাশ তাদের :

—টাকা ! খেতে পরতে থাকতে দিইচি এই ঢের। আবার টাকা ! দলে আছিস আবার টাকা !

—মজুরি দেবা না ? কেউ হয়তো বলে ওঠে।

জবাব দেয় অবিনাশ :

—দল ছেড়ে দে বাবা। পায়ে ধরে তোকে সাধিনি। আমার পুতুল সব জ্যান্ত, আপ্‌সে নাচবে। বুঝলি ?

এ-হেন অবিনাশ একটার পর একটা লোককে তাড়িয়েছে, তার জায়গায় পাঁচটা লোক পেয়েছে সেদিন।

আজ কেমন দিন বদলাচ্ছে। একেবারে সমস্ত দিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচার আর প্রতিষ্ঠার বোঝা এমনি করে তার উপর উল্টে পড়বে, ধ্বসে পড়বে তার তাসের প্রাসাদ, কল্পনাও করেনি অবিনাশ। তাই শিউরে উঠেছে আজ।

আজ সব ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে।

মেলা-কর্তৃপক্ষ আর টাকা দিতে চায়নি তাকে। রাতারাতি তার খ্যাতি যেন চলে যেতে বসেছে।

কালকের পুতুলনাচে তার এখানে লোক জমেনি। ওই পুরনো পুতুল, সেই বুড়োবুড়ির নাচ, আর পুরনো গান। ওই ভূতের নাচ আর খেউড় শুনতে কেউ আসেনি। নতুন স্বাদ পেয়েছে আজ তারা।

পুতুলনাচ নয়—যাত্রার চেয়েও ভালো, পুতুলের একেবারে পালাবন্দী থিয়েটার, আলো, রং, কত সুর গান এক্‌টো—সব রয়েছে পুরন্দরের দলে। সেইখানেই ভিড় করেছে তারা।

অবিনাশ অধিকারী তাই আজ বাতিল।

তবু অবিনাশ কোট ছাড়েনি।

ভূপতি কুণ্ডু মশাইকে বলে ওঠে অবিনাশ ঃ

—এই শর্মা না হলে যে মেলা জমতো না কত্তা, সে দিনগুলো ভুলে গেলেন ?

কুণ্ডু মশায় বলেন ঃ

—সেদিন নতুন ধরনের খেলা আসেনি। আর টাকা দিতে পারবো না। যা দিয়েছি ওই ঢের।

চুপ করে কি ভাবছে অবিনাশ। এ ভাবে কথা শোনেনি সে। রাগে অপমানে কাঁপছে। বলে ওঠে ঃ

—তাহলে খেলা তুলে নিয়ে যাবো আজকালের মধ্যেই। নতুন মেলায় যাবো। জল্পেশ্বরের মেলায়—

কুণ্ডুমশাই বলেন—তা আপনার ইচ্ছে।

গুম হয়ে বের হয়ে আসে অবিনাশ অধিকারী। এখান থেকে চলেই যাবে। কালো শরীর রাগে দাঁড়কাকের মত ফুলে উঠেছে। চুপ করে নিজের আস্তানায় ফিরল অবিনাশ।

ফিরে এসে হুকুম দেয়—মালপত্র গোছা।

দোহারকি বলে :

—জমাটি মেলা—সি কি গো ?

বাজনদার বলে ওঠে—ভর্তি গাজনে ঢোল ফাঁসাবা ?

সকলেই অবাক হয়েছে অবিনাশের এই সময় এ মেলা ছেড়ে চলে যাবার কথায়।

তাদের দলের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। এ যেন মস্ত অপমান। আগে অবিনাশ যেখানে যেতো, সেখানেই যেন শিকড় গজাতো তার। আজ সব বদলে যাচ্ছে।

অবিনাশ বলে উঠে—ছোটলোকের জায়গায় আর থাকবো না। জল্পেশ্বরের মেলায় যাবো।

—সমুদ্দুর থেকে খালে ?

অবিনাশ ধমক দিয়ে ওঠে :

—এত যদি শখ, সমুদ্রেই থাক রে শালা। কাউকে চাই না। দল তুলেই দোব।

বলরাম জানতো এমনিই একটা কাণ্ড হবে।

এইবার খসার পালা। গাছ একদিন ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে—এইবার সব ঝরে পড়বে, খসে পড়বে।

অবিনাশ গুম হয়ে কি ভাবছে।

দুপুরের নির্জনতা নামে মেলায়। এখন কোন লোক নেই—যাত্রী নেই। আলো বাজনা কোন কলরবও নেই।

এই সময় মেলার কঙ্কালসার কদর্য চেহারাটা ফুটে উঠেছে। বাঁশ খড় তালপাতা আর টিনের বেড়া দেওয়া ঘর। সামনের দোকানেও সাজানোর বাহার নেই।

এর চেয়ে কদর্য লাগে কাঁদরের ধারের ওই বস্তিটা। তার চেয়ে খারাপ লাগে ওইখানের বাসিন্দাদের।

সন্ধ্যাবেলার আগেই ওরা সেজেগুজে ভোল বদলে নেয়, হাড়-বেরকরা চিমসে মেয়েমানুষগুলোকে তখন আর চেনা যায় না।

দিনের বেলায় তাদের রূপ আলাদা।

বেলা হয়ে গেছে।

কারোও ঘুম তখনও ভাঙেনি। নেশার ঘোর ফিকে হয়ে আসছে। দু-একজন মাত্র উঠেছে ওপাড়ায়।

কেউ বা দিনের ভাতের যোগাড় করছে। রান্না সেরে ও-বেলার জন্য রেঁধে আবার খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবে।

ঘুমও আসে। সারারাত্রির ওই উন্মাদ কলরবের পর সারা শরীর বিকল হয়ে থাকে। তাই ঘুমের অভাব হয় না তাদের।

চোখ মেলে বিকালের সময়।

গাছে পাতায় দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। কাঁদরের নির্জন তীরে বিষকরমচা গাছ থেকে ফুল ঝরে ঘোলা জল ভরে যায়, মাটিতে ছিটিয়ে পড়ে থাকে অর্জুন ফল।

ক'টা দিন নির্জন মাঠের ধারে মানুষ আসে।

বর্ষার সময় মাঠ-কাঁদর ছাপিয়ে ওঠে। আজও তার বুকে কালো মেঘছায়া-ঢাকা আকাশ আর জনহীন স্তব্ধতার ছায়া নেমেছে।

ললিতা চুপ করে বসে আছে একটা জামগাছের নীচে।

শখ করে কোন জমিদার এই বাগান লাগিয়েছিলেন; তবু লোকে মাঠের মধ্যে দু'দণ্ড ছায়া পাবে, তেষ্টায় জল পাবে এর মস্ত দিঘি থেকে। নাম করবে তাঁর। জলদান, আশ্রয়দান সেদিনের মানুষের কাছে ছিল পুণ্যকর্ম।

আজ যুগ কাল বদলেছে। সেই বাগান জুড়ে মেলা বসেছে; লোকের কলরব ওঠে।

তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এমনি একটি পরিবেশে ভরে উঠবে তাঁর গড়া এই ছায়াময় বাগান।

ললিতা জানে আজ মাসী আর পাঁচু ওর দিকে নজর রেখেছে। পুরন্দরের পুতুলনাচ দেখতে যাওয়া হবে না।

মনকেমন করে। দিনের আলো কমে আসছে—সেই সঙ্গে ওব মনেও নেমে আসে অজানা ভয়েব একটা কালো ছায়া। হতাশার পুঞ্জীভূত বেদনা তাতে মিশেছে।

পাখী ডাকে, আবার স্তব্ধতা নেমে আসে। বাগানেব মধ্যে ঝুপড়িতে দু'-একজন জেগে উঠেছে।

এইবার ওদের জীবন শুরু হবে। দিনের বেলায় ওরা ঘুমোয়, আব রাতে জেগে থাকে। রাতের পর রাত—কোন পশুর মত।

এই জীবন থেকে পালাতে ইচ্ছা কবে ললিতাব।

অন্ততঃ গাঁয়ে ফিরে যাবে ভাবে। কিন্তু অনেক পথ। পয়সাও নেই।

মনে মনে তবুও ভরসা হয়—পুরন্দর এখানে আছে। তার পুরন্দর।

কাল রাতে পালিয়ে এসেছিল।

এত বড় মেলায় ওদেব আস্তানা ও জানে না।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে অবাক হয় ললিতা। কালো, মিশকালো যমদূতের মত একটা লোক গাছতলায় ওদের ঝুপড়িব সামনে চারপাইএ এসে বসল বৈকালের আবছা আলোয়। লোকটির দিকে চেয়ে থাকে ললিতা।

মাসী তাকে আপ্যায়ন করে।

ললিতাও জেনে ফেলেছে এই সুযোগ। মাসীর পরিচিত কোন লোক এলে মাসীর মনমেজাজ একটু ভাল থাকে, বকাঝকা করে না। এই সময় কিছু আবদাঁর করলে মাসী তা রাখে। কথাটা এখনই পাড়বে ললিতা।

অবিনাশ অধিকারী আজ মনস্থির করে ফেলেছে।

এ মেলা ছেড়ে যাবে অন্য মেলায়। এক দরজা বন্ধ তো অবিনাশ এখনও অন্য দরজায় পথ পাবে।

যাবার আগে তাই মনোমোহিনীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অনেকদিনের পরিচয় তাদের, পথে পথেই এ পরিচয় গড়ে উঠেছিল তাদের।

মাসীর যে একটা ভালো নাম ছিল, একদিন তার রূপযৌবন ছিল—একথা ললিতার মনে করতেও হাসি আসে। আজও তার অবশেষ কিছু আছে এটা দেখে যেন অবাক হয়েছে সে।

ললিতা ওই লোকটার হাসি দেখে অবাক হয়েছে। কালো লোকটা কি বলে চলেছে।

এ মেলা থেকে চলে যাবে সে। নাম শুনেছে লোকটার, আজ তাকে দেখল ললিতা।

ললিতা দূর থেকে ওদের দেখছে।

মাসী মেলায় এলে স্বভাব-রীত বদলায়।

একটু পান-টান করে মাঝে মাঝে। আজ অবিনাশ এসেছে—মনোমোহিনী কেমন অজান্তেই আগেকার মত রঙীন মনের একটু রেশ খুঁজে পেয়েছে। অবিনাশ হতাশাভরা সুরে বলে ঃ

—আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে মনো।

মনোমোহিনীর চোখে কেমন হাসির আভা।

অবিনাশ পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে দেয়।

—কিছু আনাও। তোমার বোনঝিই বা কোথায় গেল ?

ললিতাকে ডাকে মাসী।

মাসী জানে, অবিনাশের পকেটে এখনও কিছু টাকা আছে। ললিতা এগিয়ে আসে। অবিনাশ—প্রৌঢ় অবিনাশ অধিকারীর চোখদুটো দ্রব্যগুণে লাল, নেশার বিরাম আজ তার নেই।

সামনে নিশ্চিত পরাজয় দেখে সে যেন আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। উত্তাল স্রোতে ভেসে যাবার আগে যেন খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা।

ভাল করে দেখছে ললিতাকে। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে। সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ললিতার ওকে দেখে।

মাসী ওকে যেন নীরব দৃষ্টিতে শাসন করছে।

অগত্যা বসে রইল চুপ করে।

মাসী নিজেই গেল পাকি মদ আর কিছু মাংসের খোঁজে।

বেশ অনুভব করেছে লোকটা আজ জ্বলছে মনে মনে—মদের নেশায় আজ চুর হয়ে পড়বে।

হাসে বুড়ি মনে মনে পুরুষগুলোর আদিখ্যেতা দেখে।

সমবেদনা পাবার আশায় ওরা আসে তাদের কাছে। যারা দিন-রাত জ্বলছে ওদের অত্যাচারে আর হিংসায়, তাদের কাছে আবার পুরুষ আসে সমবেদনার আশায়—দুঃখে ভরসা পাবার আশায়।

ঝাঁটা মার মুখে! হাসিও আসে ওদের বেহায়াপনায়।

আপনমনেই ও-কথাটা প্রায়ই বলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে বাগানে।

মেলা জেগে উঠেছে—দিনের ঘুম তার ভেঙে গেছে। আড়িমুড়ি ভেঙে ক্লান্ত দৈত্যটা আবার জাগছে কি এক আদিম বুভুক্ষা নিয়ে। এ ক্ষুধার শেষ নাই।

এ কান্না আর ফুরোয় না।

একদিকে আলো জ্বলে, অন্যদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসে। নিবিড় অন্ধকার।

এ যেন অন্য কোন রাজ্য।

পুরন্দরের পুতুলনাচের ওখানে আলো জ্বলে উঠেছে। জোরালো আলো, সুর ওঠে।

পুতুলনাচের আসরে আজ লোক ধরে না।

ইতিমধ্যে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ অবিনাশ অধিকারী ক্ষেপে গেছে। চাষীবাষী, দূর-দূরান্তরের যাত্রী, মেলায়

মেলায় জীবন কাটানো দোকানদার—সকলেই শুনেছে কথাটা। এতদিন নাম-করা মেলার অঙ্গ, অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে অবিনাশ অধিকারীর দলের নামও করা যেত।

সেই অবিনাশ অধিকারীর দলকে কোণঠাসা করে দিয়েছে ওই পুরন্দর সূত্রধর। তাই এত ভিড় নামছে ওখানে।

যেমনি পুতুলনাচ, তেমনি পালা গায় পুরন্দর।

গান শুনলে চোখ দিয়ে জল ঝরে।

মেলার লোক ভিড় করেছে। আগে থেকেই জায়গা নিয়ে বসে আছে। কলরব করছে তারা, দূর-দূরান্তরের যাত্রী দর্শকও এসেছে।

চার পয়সা টিকিট আজ থেকে।

ন্যাড়া রামপদ ভিড় সামলাতে পারে না।

ঠিক কাজের সময়ই এসে জুটেছে বলরাম। সে-ও আটপিটে লোক। ভিড় সামলে বন্দোবস্ত করে দেয়।

পয়সা যেন আকাশ থেকে পড়ছে।

ভূপতি কুণ্ডু, বিনোদ ডাক্তার আজও এসেছেন। দুজনে দুটো টাকাই দেন।

—আজ্ঞে!

ন্যাড়া হাতজোড় করে।

হাসেন কুণ্ডুমশাই: নাও হে! রাখো। শুরু করছ কখন?

ন্যাড়া সবিনয়ে জবাব দেয়:

—দেরি নাই আর।

মহা উৎসাহে আজ ওরা কাজ করছে।

পথের কাঁটা এতদিনের পাহাড়কে এত সহজে সরাতে পারবে ভাবেনি ন্যাড়া। আজ তাদের মহা আনন্দের দিন।

পুরন্দর ভিতরে যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে। দুটো হাত আর আঙুলগুলো যেন নিমেষের মধ্যে নড়াচড়া করছে। বলরাম মুগ্ধ হয়ে দেখে। আজাহার গান শুরু করেছে। এ দলের রীতিনীতিই আলাদা।

অবিনাশের বেহালাদারও এসে জুটেছে ও-দল ছেড়ে এখানে।

এতদিন ওখানে বাজাবার মত কিছু পায়নি, এখানে, তার হাত খুলেছে। আজাহারও গাইছে সুরেলা গলায়।

ন্যাড়া পার্ট বলে চলেছে—রাবণের পার্ট।

সুর, ওই বাজনা আর তার সঙ্গে পুতুলনাচ—সব মিশে একটা চমৎকার ভাব ফুটিয়ে তুলেছে পুরন্দর।

বলরাম এমন খেল্লা অনেকদিন দেখেনি, তাছাড়া আলো আর সুর দুই মিশেছে এর সঙ্গে।

গমগম করছে আসর।

জমে উঠেছে খেলা; গ্যাসের আলোর ফোকাস বানিয়ে নিয়েছে ন্যাড়া। আলোর কারসাজিও আছে।

সুরের সঙ্গে অভিনেতার অঙ্গে এক একরকম আলো পড়ে। পরিবেশ বদলে যায়। দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে তাই দেখছে।

কাকে খুঁজছে পুরন্দর। ব্যগ্র দু'চোখ দিয়ে ভিড়ে কাকে সন্ধান করছে। যার কালো ডাগর দুটো চোখ তার চোখে পড়লে সব থেকে খুশী হবে সে, তাকেই সন্ধান করছে পুরন্দর।

ললিতা আজও আসবে বলেছে। তাকেই খুঁজছে।

সমস্ত নাচ-গান তার জন্যেই যেন আজ সুন্দর সার্থক হয়ে ওঠে। মুগ্ধ জনতার আনন্দের চেয়ে তার আনন্দ মনে সবচেয়ে বড় তৃপ্তি দেবে। কিন্তু দেখতে পায় না তাকে।

রাত হয়ে গেছে।

মুগ্ধ জনতা আবার কালকের জন্যে ফিরে গেল।

কাল পালা গাইবে সিন্ধুমুনি। রামায়ণ শুরু করবে এইবার।

রাত্রে ন্যাড়া বলেঃ

—একটা কলের গান, চোঙওয়ালা সেই যে বাজে—তাই কিনবো এবার পুরোদা—আর লাল-নীল কাঁচ কিছু।

—টাকা? পুরন্দর বলে ওঠে, অনেক টাকা লাগবে যে।

ন্যাড়া বলে:

—সে তুমি ভেবো না। আজ টিকিট বিচেছি কত জানো? প্রায় একশো টাকার উপর। কাল থেকে টিকিটের দর দু' আনা চার আনা এক আনা করবো।

—লোক আসবে তো রে? পুরন্দর একটু ভয় পায়।

ন্যাড়া মাথা নাড়ে: যাবে আর কুথায়! এইখানেই আসতে হবে।

আজ সবাই ওরা খুশিতে ফেটে পড়ে। দলের রূপ বদলাবে এইবার। বাঁধুক সে নতুন পালা। বাকী সব ভার তাদের।

পুরন্দরও মনে মনে জোর পায় আজ।

ললিতা আসেনি আজকের আসরে।

পুরন্দর এদিক-ওদিকে খুঁজছে তাকে। অন্ধকার পথে সেই গাছ-তলায় আজ তার জন্যে পথ চেয়ে কেউ নেই।

মন কেমন করে। ফিরছে পুরন্দর।

ঝিঁঝিঁডাকা রাত্রি। জোনাক জ্বলে আকাশে। কি ভেবে ওই বাগানের দিকেই এগিয়ে যায়। কেমন বিচিত্র স্তব্ধ পরিবেশ এখানে। বাতাসে কিসের টক-টক গন্ধ। এ যেন অন্য কোন জগৎ।

অন্ধকার বাগান, দূরে এদিক-ওদিকে দু'-একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে।

গানের সুর ওঠে, ঢোল বাজছে।

কারা টলতে টলতে ওই বাগানের দিক থেকে বের হয়ে এল।

তাদেরই প্রশ্ন করে পুরো:

—ললিতাকে চেন? এই দিকে থাকে।

কেউ দাঁড়াল না, আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে সরে গেল।

পুরন্দর সামনে কাকে দেখে খোঁজ নেয় আবার।

মত্তপ কণ্ঠে কে বলে ওঠে:

—ললিতা! ওখানে সবাই এক-এক ললিতা। কোন্‌টিকে চাই বাবা?

পুরন্দর ওদের কথার নমুনা দেখে থমকে দাঁড়াল।

কোথায় একটা বেসুরো গলায় খেউড়ের সুর উঠছে—আঁধারে কার হাসির শব্দ শোনা যায়।

অবিনাশ সেই বৈকাল থেকে এসে বসে আছে এ-পাড়ায়, আর ওঠেনি।

অন্য সময় সন্ধ্যার আগেই উঠে যেত নিজের কাজে। মদ খেতো, কিন্তু সে খাওয়াও ছিল সীমাবদ্ধ। এমন করে মদ গিলত না।

আজ মনোমোহিনীও অবাক হয় ওর কাণ্ড দেখে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অবিনাশ তবু ঠায় বসে আছে। কথাবার্তাও বলে না বিশেষ।

অবিনাশের আজ কথা বলবার মত মন নেই। আজ সব কথা যেন তার ফুরিয়ে গেছে। মনের মধ্যে ভবিষ্যতের চিন্তা মুছে গিয়ে ভেসে ওঠে আগেকার সেই শান্ত দিনগুলো।

সেদিন সবই ছিল তার—ঘর, ভালবাসার মানুষ; এমনকি মেয়ে পর্যন্ত। কিন্তু কোন কিছুকেই আমল দেয় নি অবিনাশ। বলতো—পুতুলের ঘরকন্না; এই আছে, এই নাই। ওসব আবার দরকার নাকি মানুষের!

তাই সব পিছনে ফেলে এসেছে।

ঠিক পিছনে নয়—পথের উপর ঘরকন্না গড়েছিল, পথেই তা ছিটিয়ে দিয়েছে।

আজ সেই কথা ভাবে।

এই যাযাবর জীবনে ক্লান্তি এসেছে। মনে হয়, বাইরে নয়, আজ আবার সব কুড়িয়ে সে শান্তি পেতে চায়।

মনোমোহিনী একদিন ভালোবেসেছিল লোকটাকে নিবিড় ভাবেই। মনের কোণে তার আশা ছিল তাকে নিয়ে ঘর-বসত করবে।

কিন্তু তা হয় নি।

নিষ্ঠুর আঘাত আর ব্যর্থতায় সেদিন অবিনাশ তাকে যেন লাথি মেরে আবার পথেই ফেলে দিয়ে উধাও হয়েছিল।

সেই অপমান আজও ভোলেনি মনোমোহিনী। শুধু ওই অবিনাশের উপরই নয়, সারা পুরুষজাতটার উপর তার বিজাতীয় ঘৃণা।

মনোমোহিনী আজও ভোলেনি সে কথা। তাকে না ঠকাক, অবিনাশ নির্দয়ভাবে ঠকিয়েছিল তারই আপন বোনকে।

ওর দল তখন চালু। মনোমোহিনীর আপন বোন বাসিনীকে অনেক আশা অনেক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল ওই অবিনাশ।

মনোমোহিনী সেদিন যে লোকটাকে ভালবাসেনি তা নয়, হঠাৎ যেদিন বুঝতে পারে তার ছোট বোন বাসিনীর উপরই ওর দুর্বলতা বেশী, সেদিন মোহিনী দুঃখও পেয়েছিল। চমকে উঠেছিল।

পরিষ্কার করে কথাটা জানাতে পারেনি সে বাসিনীকে, তবু আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল ওই অবিনাশ ভালো লোক নয়। কিন্তু বাসিনী তা বুঝতে পারেনি। বিয়েও করেছিল সে বাসিনীকে।

কি এক আশা করে গিয়েছিল ওর ঘরে। মা-ও হয়েছিল সে।

ললিতা হবার ক'মাস পরই অবিনাশ বাসিনীকে পথেই দূর করে দেয়। কোথায় আর যাবে বাসিনী কচি মেয়েটাকে নিয়ে, যাযাবর বোনের আশ্রয়েই এসে দাঁড়াল আবার সেই পথে।

চোখের জল মুছে সেদিন মনোমোহিনী বোনকে ঠাঁই দিয়েছিল। বাসিনী নেই, আজও মনোমোহিনী সেই কঠিন বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে। ললিতা ওই বাসিনী আর অবিনাশের মেয়ে।

পুরুষদের সে বিশ্বাস করে না। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু ঠকানোর দরকার, ঠকিয়ে পয়সা নেয় মাত্র।

অবিনাশকে যে নিজে একদিন ভালবেসেছিল, সে-কথা আজ একরকম ভুলেই গেছে মনোমোহিনী। আজ অবিনাশকে সে ঘৃণা করে।

ও লোকটাকে ক্ষমা করতে পারে না সে।

অবিনাশ আজ মদ খেয়ে চুপ করে বসে আছে।

মনোমোহিনীও অবাক হয়। লোকটা কেমন নিদারুণ আঘাতে মুষড়ে পড়েছে। শুনেছে ও মেলার কথা।

লোকটাকে ললিতা দেখছে—কেমন যেন অসহায় একটা মানুষ। একটা ধ্বংসস্তূপ।

ললিতা প্রথমে ভেবেছিল অন্যরকম।

লোকটার জানোয়ারের মত চেহারা—আর মদ গিলেই চলেছে। কিন্তু এ যেন অন্য কি চায়। দরদভরা চাহনিতে দেখছে সে ললিতাকে।

মনে হয় ঠিক চিনতে পারে নি ওকে।

ললিতার কেমন মায়া হয় ওর ওপর।

অবিনাশ বলে ওঠে:

—আমার মেয়েকে অনেকদিন দেখিনি, না রে মনো?

মাসী চমকে ওঠে। ললিতাও অবাক হয় ওর কথাটা শুনে। কেমন যেন আপনকরা সুর ওই লোকটার গলায়। ললিতা তার বাবাকে চেনে না।

মনোমোহিনী আগেকার দিনগুলোর কথা মনে করতে চায় না। অন্ধকার স্মৃতিতেই তা ঢাকা থাক। ও সব ভুলে যেতেই চেয়েছে।

কোন স্বীকৃতি তাদের সমাজ দেয়নি। অবিনাশ তখন যুবক। মনোমোহিনী সেই দিনগুলো আজও ভোলেনি। মনোমোহিনীর মনে হয়, ভুল করেছিল সে। বাসিনীও সেই একই ভুল করেছিল।

অবিনাশ সেদিন যদি আশ্রয় দিত, আজ হয়তো এমনি করে ভেসে বেড়াতে হতো না। নিজের বোনের মেয়েকেও আজ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এতবড় বঞ্চনার দুঃখ সইতে হতো না। ললিতাও জানে না তার আসল পরিচয়। সব ছায়াবাজির মত মিথ্যা সত্য একাকার হয়ে গিয়েছে।

যা হয়নি তার জন্য আর দুঃখ করে লাভ কি!

যা অতীত তা অতীতেই থাক। ললিতাকে জানতে দিতে চায় না সে-সব কথা। জেনেও কোন লাভ নেই কারো।

মনোমোহিনী বলে ওঠে:

—সে হিসেব কি আমি রেখেছি? আমার হিসেবই কে রাখে তার ঠিক নাই। আবার কে কবে কি করল তার কথা!

ললিতা তবু ওদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। অদৃশ্য কোন একটা স্পর্শ তার মনকে অজানা এক বিচিত্র আশার সুরে ডাক দেয় বার বার।

লোকটা তার দিকে কি এক স্নেহভরা বুভুক্ষু চোখে চেয়ে আছে। ললিতার দিকে অমনি ব্যাকুল স্নেহময় চাহনি নিয়ে কেউ চায়নি আজ পর্যন্ত।

মাসীর কথায় ললিতা কি ভাবছে। মুখে-চোখে তবু লোকটার জন্য অপরিসীম একটা বেদনা।

ললিতাও শুনেছে অবিনাশের পরাজয়ের কথা। লোকটার দুঃখে প্রথমে আনন্দই পেয়েছিল, পুরো জিতেছে। এখন লোকটার পানে চেয়ে নিজেই অবাক হয় ললিতা, অবিনাশের জন্য দুঃখ বোধ করে।

মনে হয়, ও যেন কোন কালের অতি আপন জন। বহুদিন পর ফিরে এসেছে তাদের কাছে।

অবিনাশ বলে ওঠে :

—আজ আমার ডান হাত ভেঙে গেছে মনো। যেদিন বাঁচতে চাইলাম, সেদিন ভগবান আমাকে ঠকালো সবচেয়ে বেশী।

মনোমোহিনী এ-সব কথায় কান দিতে চায় না।

—কেনে ?

তবু মনোর কণ্ঠে কি একটা সহানুভূতির সুর।

অবিনাশ বলে চলেছে বেদনাভরা স্বরে :

—দল আর রাখতে পারলাম না। অনেক পয়সা পেয়েছি, খাতির, মান—সব কিছু। আজ এক ফুঁয়ে এতদিনের পিদিম নিভে গেল। তবু ছাড়বো না আমি।

ললিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে ডাগর দু চোখ মেলে।

লোকটার অন্তরে একটা নীরব বেদনা রয়ে গেছে। ললিতাই জিজ্ঞাসা করে :

—দল ছেড়ে দিলে ?

—হ্যাঁ। ওই কাঙ্কেরর ছোঁড়া পুরন্দর, ও-ই হল উপলক্ষ্য। ওর জন্যই এই পথ ছেড়ে দোব মা।

চমকে ওঠে ললিতা ওর কথায়।

নিজেও আজ এর জন্য কম দায়ী নয়। কে জানতো পুরন্দর এমনি একটি লোকের জীবনে এত বড় বিপর্যয় আনবে। চরম বিপর্যয়।

দুঃখ হয়।

অন্ততঃ দুজনে পাশাপাশি টিকতেও তো পাবতো।

অসহায় অবিনাশ আজ এতদিনেব চাপা কামনা ব্যক্ত না করে পারে না। আকুতি জানায়।

—ঘুরে ফিবে চলো মনো।

ললিতা চমকে ওঠে ওব ব্যাকুল ডাকে।

কেমন যেন কাঁপছে সে। জীবনে তার সবই ছিল, সবই পেয়েছে সে। কিন্তু কেমন নিয়তিব অভিশাপে বিষাক্ত আব তিক্ত সে ফল। শুধু অতৃপ্তি জ্বালা আর কান্না আনে। সব থেকেও সে কিছু পায়নি।

অবিনাশ বলে চলেছে:

—আজও সব গুছিয়ে নিতে পারবো মনো। তুমি আমার সঙ্গে চল। মেয়েও চলুক। এসব আর কেন? ঢের হয়েছে।

ললিতা কেমন গুমরে কাঁদে। সরে গেল সে। যেন স্বপ্ন দেখছে। বাবা! মা!! মা কবে মরে গিয়েছে, মাকে মনে পড়ে না।

এতদিন যেন কোন ছায়াবাজির সংসারে ঘুরেছে। মাসীও কি এক লজ্জায় তাকে আসল পরিচয় দিতে পারেনি। অবিনাশ আজ এসেছে ওদের সব ফিরিয়ে দিতে। ললিতা অবাক হয়েছে এই ভাগ্যে।

অবিনাশের কথাগুলোয় ওর মনে ঝড় উঠেছে। অবিনাশ বলে ওঠে:

—এতদিন যে পরিচয় দিইনি, আজ তা সব মেনে নোব।—আমার মেয়েকেও।

মনো কি ভাবছে। জীবনের শেষ দিনে, সর্ব ঝরার দিনে মানুষ বোধহয় এমনি কাঙাল হয়ে ওঠে। ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন নতুন করে বাঁচবার জন্য।

ললিতা এখানে নেই।

অবিনাশ সব হারিয়ে আজ আবার ছোট্ট ঘরে ফিরতে চায় ওদের নিয়ে।

মনোমোহিনী কি ভাবছে, বোধহয় আগেকার সেই ভালো-লাগা মনটাকে খুঁজছে। কিন্তু যেন সাড়া পায় না।

মনো আজ বদলে গেছে। যে মন একদিন বহু অতীতে ওই লোকটাকে নিঃশেষে ভালোবেসেছিল, সে আজ বহু দুঃখে-কষ্টে আর বাঁচবার কঠিন সংগ্রামে নিঃশেষে মরে গেছে। ওকে সহ্য করতে পারে না আজকের মনোমোহিনী।

আজ সে জানে অবিনাশ শেষ হয়ে এসেছে। ওর ডাকে তাই সাড়া দিতে আজ পারে না। চুপ করে থাকে, বিরক্তি বোধ করে অবিনাশের ডাকে।

—মনো!

রাত হয়েছে। ওরা কেউ বের হতে পারেনি।

মনো ঝাঁঝিয়ে ওঠে:

—মাতলামি করবার জায়গা পাওনি? এমনি যাবা, না পাঁচুকে ডেকে তাড়াবো? ওঠ—

অবিনাশ অধিকারী অবাক দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে থাকে। তাকে এমনি করে তাড়িয়ে দিতে সাহস করবে, ঠিক জানতো না।

কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

মনো বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আসরে যেতে পারছে না, সারারাত্রি ওই রামায়ণ শুনে কাটাতে হবে,—ঘেন্না ধরে গেছে মাতালের কথায়। ঢের দেখেছে।

—তাড়িয়ে দেবে মনো!

অবিনাশ যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাগুলো।

ফোঁস্ করে ওঠে মনো ঃ

—নয়তো কি ধান-দুব্বো দিয়ে পূজো করবো গোঁসাইকে! উঠলে! ওঠো বলছি! এখুনি ওঠো!

অবিনাশকে একটা ধাক্কা দিতেই কেমন বেসামাল হয়ে সে চারপাই থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় ঘাড়-মুখ গুঁজে।

—মাসী!

ললিতা ওপাশেই ছিল। শুনেছে সব। লোকটার উপর অমনি অত্যাচার দেখে আর থাকতে পারে না। এসে দাঁড়ায় ওর সামনে। চিৎকার করে ওঠে মাসীর এই ব্যবহারে।

নিজে হাতে ধরে ওকে তুলে বসাল। অবিনাশ তখনও কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আসে তেষ্টায়।

—একটু জল দেবা মা?

ললিতা ওকে ধরে বসিয়ে জলের ঘটিটা এগিয়ে দেয়।

অবিনাশের চোখ দিয়ে জল বের হচ্ছে।

নেশা করলেও চেতনা হারায়নি সে। কেমন যেন স্বপ্ন দেখছে। তার স্ত্রী আর মেয়ে নিয়ে ঘর কেমন সুন্দর হয়ে উঠতো। স্বপ্ন সার্থক হতো, কিন্তু হয়নি।

ললিতা তার মুখে-চোখে জল দিতে একটু সুস্থ বোধ করে অবিনাশ। এই স্পর্শ তাকে কোন দূর অতীতে নিয়ে গেছে।

অবিনাশের আজ মনে হয় যাকে যা আঘাত দিয়েছিল অতীতে, সবই একে একে ফিরে পাবে সে। পাচ্ছেও।

মনোমোহিনীও আজ জবাব দিতে চায়।

জীবন তার সঙ্গে নিদারুণভাবে ছিনিমিনি খেলেছে। আজ মরীচিকার মত জলের ইশারা দেখিয়ে শুধু মরুভূমির বুকে তৃষ্ণাই বাড়িয়েছে ওর।

ওর দিকে চেয়ে থাকে অবিনাশ।

ললিতাও দেখছে মানুষটাকে—অসহায় পরাজিত একটা মানুষ। তারই আপনজন। নিবিড় মমতা বোধ করে ললিতা ওর জন্য।

মাসী কেমন যেন ওকে তাড়াতে চায়।

ললিতার মনে কোন ছাপ রাখুক ও—এ সে চায় না। মনোর ভাবনা অন্য রকম।

যারা ভেসেই বেড়াবে চিরকাল, ঘরের বাঁধন ভালোবাসা স্নেহ—এসব তাদের কাছে মূল্যহীন। কোন দাম নেই, শুধু জঞ্জালই বাড়ায় মাত্র। বাধার সৃষ্টি করে পায়ে পায়ে। মনের অনেক নরম ঠাঁইয়ে আঘাত দেয়। ওদের সরানোই ভালো। তাই অবিনাশকে সরাতে চায় সে।

আবার দাবড়ে ওঠে মাসী ঘেয়ো কুকুরের মত দাঁত বের করে :

—যাবে, না ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তাড়াব? মদ মেরে পীরিতের কথা বলতে এয়েছেন এতকাল পরে!

ললিতা আজ ওই অসহায় লোকটাকে একটা অবলম্বন—অনাস্বাদিত প্রীতির একটু স্পর্শ বলে জেনেছে। ওই ঘেয়ো কুকুরের মত মেয়েছেলেটা, এতদিন যাকে মাসী বলে ডেকেছে, আজ সে ললিতার সর্বস্বের বিনিময়ে বেঁচে আছে। তাই বেশ জোরের সঙ্গে আজ ললিতা দাবি জানায়, শাসনের দাবি। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয় মনো। ললিতা বেশ জোর গলায় বলে :

—ও যাবে না।

চমকে ওঠে মাসী ওর কণ্ঠস্বরে। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—কি বললি?

ললিতা আজ নিজের পথ নিজেই বের করে নিতে চায়। সে বলে :

—সবই শুনেছি তোমাদের কথা। আজ তোমাকেও ঘেন্না করি। একজন যদি বাঁচতে পারে—ও বাঁচবে। ও যাবে না এখান থেকে।

—ললিতা! কি শুনেছিস?

—সবই।

চমকে ওঠে মাসী। সবই শুনেছে ও! কেমন যেন সুর নেমে আসে মনোমোহিনীর। নিজেরই লজ্জা আসে তার।

ললিতা বলে :

—এতটুকু মায়াদয়াও শরীরে নাই তোমার? তুমি আবার মায়ের আপন বোন মাসী!

মনোমোহিনী চুপ করে গেছে। এতদিন যা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল, আজ তা সব দিনের আলোর মত প্রকাশ পেয়ে গেছে। ললিতা জানে না অবিনাশ কত বড় অপমান করেছে তাদের। কি আঘাত দিয়েছিল।

মাথা নাড়ে মাসী : দয়া থাকতে আর দিয়েছে কই! দোষ কি একা আমারই? সবই আমার বরাত মা।

অবিনাশ অধিকারী খুঁটি ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এখানে যেন বোঝা হয়ে পড়ে আছে সে।

কোন রকমে বের হয়ে যাবে।

—কোথা যাচ্ছ?

ললিতা এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে আটকালো। অবিনাশের আজ মনে হয় এত বড় দয়া জীবনে তাকে কেউ করে নি, আজ কাঙাল সে। তাই যেন ফিরে যেতে চায় অবিনাশ শূন্য হাতে। ওর কথায় বলে ওঠে :

—বাসায়। চলে যেতে পারবো।

ওর হাতটা ধরে বাধা দেয় ললিতা :

—না, যেতে পাবে না তুমি। একসঙ্গেই কাল চলে যাবো আমরা।

—যাবি মা? অবিনাশ অবাক হয়েছে। কেমন টলছে সারা দেহ।

ওকে ধরে ফেলে ললিতা। কাঁপছে ওর সারা শরীর। ধরে বসিয়ে দিল অবিনাশকে!

আবছা অন্ধকারে একটা লোক চালার নীচে ওর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে। সামনেই তাকে দেখে চমকে ওঠে ললিতা।

—তুমি !

পুরন্দর খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়েছে এইখানেই। একটা চৌখুপী আলো জ্বলছে। ললিতা কাকে ধরে বসাল খাটিয়ায় পরম যত্নে ?

লোকটাকে দেখে চমকে ওঠে পুরন্দর।

অবিনাশ অধিকারী! ওকে এখানে ললিতার কাছে দেখবে তা ভাবতেই পারেনি। বসে রইল অবিনাশ, পুরন্দরকে দেখে ললিতা এগিয়ে এল বাইরের দিকে।

সব ধারণা কেমন আজ বদলে গেছে ললিতার।

জীবনে এত বড় বঞ্চনা আর শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য আজ সব হারানোর দুঃখে মন তার ভরে উঠেছে। অবিনাশের ভাগ্যহীনতায় সে দুঃখ পেয়েছে। ললিতারও এই দুর্ভাগ্য।

পুরন্দরই এই সর্বনাশের জন্য দায়ী, আর সে-ই পুরন্দরকে এই পথে এগিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের অস্ত্র দিয়েই পুরন্দর আজ তাকে চরম আঘাত করেছে। একা অবিনাশ নয়—ললিতাও আজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বাবার এই বিপদে।

কত সর্বনাশা সে আঘাত, পুরন্দর কল্পনাও করতে পারে না—তাকে বোঝাতেও পারবে না ললিতা।

চুপ করে থাকে সে।

পুরন্দর আজ খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার স্বাদ পেয়েছে। মনে তার খুশির জোয়ার। ললিতাকে তাই জানাতে এসেছিল। ওদিকে খ্যাতি ও অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ললিতার উপরও একটা দাবি যেন এসে গেছে তার। তাই আরও কাছে পেতে চায় সে ললিতাকে।

আজ হঠাৎ এইখানে অবিনাশের এত আদর দেখে অবাক হয়েছে পুরন্দর। অবিনাশকে সবকিছু থেকে সে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু ললিতার কাছে তার এত বড় দাবি কোথায় আছে, এটা ভেবেই আজ বিস্মিত হয়েছে সে।

বেশ একটু কঠিন স্বরেই বলে পুরন্দর—ওই হতভাগাটা এখানে কেন? বুড়ো ঘাটের মড়াটা!

ললিতা আঁধারে ওর দিকে চেয়ে থাকে। পুরন্দর বেশ জানে, এখানে এই নরকে যারা বাস করে তাদের কি পরিচয়, যারা আসে তারা কোন্ উদ্দেশ্যে আসে, তাও দেখেছে একটু আগেই। ওরা অন্ধকারে আসে, আবার গা ঢাকা দিয়ে পালায় জানোয়ারের মত। অবিনাশও তাদেরই শ্রেণীর কেউ।

ললিতা কথাগুলো শোনে, বোঝে পুরন্দরের মনে আজ পরিবর্তন এসেছে, লোভ এসেছে।

এটা বুঝতে দেরি হয় না ললিতার। পুরন্দর অবিনাশকে হিংসাই করে না, অপমানও করতে চায়।

ললিতার আজ ও-সব ভালো লাগে না।

ললিতা বলে ওঠে—তুমি এত নামী লোক, তুমিই বা আঁধার রেতে মেয়েমানুষের কাছে এসেছ কেনে?

—ললিতা!

অতর্কিতে গালে যেন একটা চড় খেয়েছে পুরন্দর।

হাসছে ললিতা—রাগ করলা?

আজ ললিতার কথার সুরও আলাদা। বদলে গেছে।

কেমন স্তম্ভিত হয় পুরন্দর।

জবাব দিল না ওর কথার।

নিজের মনের সেই ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। আজ সে ললিতাকেও নিবিড় করে কাছে পেতে চায়। জীবনে যা পেয়েছে তার তুলনায় এর দাম অনেক।

—ললিতা!

আজ ললিতা জীবনের কঠিন রূঢ় বাস্তব একটা দিক চোখের সামনে দেখেছে। এ সবের উপর মোহ নেই তার। সব মোহ-মুক্তি ঘটেছে।

পুরন্দর বলে ওঠে—তোর জন্যেই এতদূর এগিয়েছি।

ললিতা আবার বলে :

—ভুল করেছিলাম তোমার সঙ্গে মিশে।

—ভুল! ভুল কেন?

পুরন্দর চমকে ওঠে।

ললিতাও সামলে নেয় নিজেকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের এমনি কোন মেলার অন্ধকারেই ওই মনোমোহিনী আর কোন তরুণ খ্যাতিমান অবিনাশ এমনি ভুল করেছিল।

সেই একই কামনার স্রোত আজও সমানে বয়ে চলেছে। সেই ভুল পথে আজও চলেছে মানুষ। কিন্তু সেই ভুল করতে আর রাজী নয় ললিতা। ওদের জীবনের একটি ভুল তার জীবন চরম ব্যর্থতায় আর দুঃখে ভরে দিয়েছে।

চোখের সামনে দেখেছে অবিনাশ আর ওই বুড়িকে, চোরের মত সব লুকিয়ে সব হারিয়ে এতদিন গা-ঢাকা দিয়ে ফিরেছে ওরা দুজনে। নিজের মেয়েকেও কোন পরিচয় দিতে পারে নি অবিনাশ।

আর ললিতা বইছে সেই পাপ আর কলঙ্কের বোঝা, তারই কালিতে মুখ কালো হয়ে উঠেছে। আজ তাই পুরন্দরকে ফিরিয়ে দেয় সে।

ললিতা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে—তুমি যাও। আমার কাজ আছে।

—ললিতা!

পুরন্দর ওর কথায় আর্তনাদ করে ওঠে।

ললিতা ফিরে যাবে। পুরন্দর আজ বহুদিন পর নিজের মনের সব বুভুক্ষার অসীম তীব্রতা অনুভব করেছে। ওকে জোর করে ধরে কাছে টেনে নেয়।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে ললিতা। এই ভোগের তৃষ্ণা আজ তার কাছে বিষবৎ হয়ে উঠেছে।

পুরন্দর যেন ক্ষেপে উঠেছে।

—জানোয়ারটা কত টাকা দিয়েছে তোকে?

ললিতা চমকে উঠেছে। পুরন্দর আজ তাকে এতবড় কথাটা এত পরিষ্কার ভাবে বলে বসবে ভাবেনি সে।

পুরো! কাকুতি জানায় ললিতা। পুরন্দর আজ বদলে গেছে।

ললিতা ওর দিকে চাইল। পুরন্দর পকেট থেকে দলামোচা পাকানো নোট ক'খানা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওকে জুতো মারছে।

—নে। এবার খুশী?

—পুরো!

ললিতা পুরুষের লালসা দেখেছে, কিন্তু পুরন্দর ছিল তার উর্ধ্বে। আজ সে-ও নীচে নেমেছে। জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায় তার সব কিছু। ললিতা বলে ওঠে:

—এই নে তোর টাকা।

পুরন্দর গর্জন করে:

—ওই অবিনাশ তোর মনের মানুষ তালে? এ্যা—

ললিতার সারা দেহে একটা তীব্র জ্বালা।

সজোরে একটা চড় মেরে বসে ললিতা ওর গালে। ঘৃণায় রাগে রি রি করছে সারা গা। পুরন্দর অতর্কিত আঘাতে ওকে ছেড়ে দিল। স্তব্ধ হয়ে থাকে সে। অপমানটা আজ বাজে পুরন্দরের।

—বেশ! গর্জন করছে সে। কি ভেবে চলে গেল আঁধারে পুরন্দর।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ললিতা। বাবা-মা-মেয়ে—কোন পরিচয় তাদের নেই—থাকতে পারে না। রাগে জ্বলছে সারা মন। রাগ আর অপমানে।

অনুভব করে নোট ক'খানা মাটিতে পড়ে আছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তাই কুড়োচ্ছে—ওগুলোর আজ সবচেয়ে বেশী দরকার। খুব দরকার।

ললিতা মনে মনে তার পথ ঠিক করেছে। আজ ওই পথ ছাড়া তার গতি নেই। পরাজিত অবিনাশ—আর ওই একটু ঘরের স্বপ্ন। জীবনের এইটুকু স্বাদের বিনিময়ে সব উঞ্ছবৃত্তি সে মেনে নেবে। তবু

এই পাপ, আর লালসার পথ থেকে সরে যাবে। যত কষ্ট হোক, এখান থেকে সরে যাবে ললিতা। এ মানুষের রাজ্য নয়—আঁধারের রাজ্য, কোন নরক।

পুরন্দর সেদিন বাসায় ফেরে স্বপ্নাবিষ্টের মত।

একদিকে সে অনেক পেয়েছে—পাবেও। খ্যাতি, টাকাপয়সা—কিন্তু অন্যদিকে যেটুকু সঞ্চয় তার ছিল, তা আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ললিতা আজ সরে যেতে চায় তার পথ থেকে ; অপমানই করেছে তাই।

—কি হয়েছে তোমার বলদিকি ?

ন্যাড়া ওর দিকে চেয়ে কিসের সন্ধান করছে। পুরন্দর মুখ ফিরিয়ে নেয়। জবাব দেয় না। চুপ করে থেকে বলে :

—শরীরটা ভাল নাই, মন-মেজাজও।

ন্যাড়া বলে—একটু জিরুলেই ঠিক হয়ে যাবে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। রাত করো না।

পুরন্দর কি ভাবছে। মনের ভিতর কেমন হু হু জ্বালা করে। দেখে এসেছে ললিতা আজ অবিনাশকে কত আদর-যত্ন করে।

ওর মনে মাথা তোলে একটা অসহায় জ্বালা।

—ঘরে ফিরে যাবি ন্যাড়া ?

ন্যাড়া বলে—মেলা ভাঙুক, তারপর যাবো।

ন্যাড়ার মাথায় নানা চিন্তা। নতুন পালার জন্য খরচপত্র করতে হবে। একটা চোঙওয়ালা কলের গানও কিনবে এইবার, তারই হিসাব-পত্র করছে।

পুরন্দর চুপ করে বসে আছে। এ-সব তার ভালো লাগে না। উঠে গেল বাইরের দিকে।

যার জন্য বের হয়েছিল—যার খোঁজ করেছে এতদিন নানা জায়গায়, সেই ললিতা আজ হারিয়ে গেল।

অবিনাশ অধিকারী তাকে যাবার সময় চরম আঘাতই হেনে গেল।

বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

চুপচাপ বসে আছে।

বলরাম ক'দিন ধরে যাতায়াত করছে। এই লাইনের আঁচপাঁচ জানে। পুরন্দরের ওই রকম মনমরা ভাব দেখে কোত্থেকে চাদরে ঢেকে একটা বেঁটেখাটো বোতল এনে হাজির করে। ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে:

—দু'ঢোঁক প্যাটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ওস্তাদ। খাটা-খাটুনিতে এমন মেজাজ বিষিয়ে ওঠে। দ্যাখো কেনে? ভালো দিশী মাল।

পুরন্দর কি ভাবছে। ওটার দিকে চেয়ে থাকে।

লোভও লাগে। কেমন একটা দুবার আকর্ষণের মত লাগে। ললিতার কথা ভুলতে পারবে। বড় দেমাক মেয়েটার।

বলরাম অভ্যস্ত হাতে বোতলের ছিপি খুলে ঢেলে দেয় গেলাসে। চালকলাই ভাজা আর তাজা পানীয়। পুরন্দরের হাত কাঁপছে। আঁধার রাত্রির হাওয়া বয়।

টক টক গন্ধ লাগে। বুক গলা সব জ্বলছে, তবু মনে হয় একটা তৃপ্ত বিভ্রান্তির শিহরণ তার সারা দেহ-মন ছেয়ে নামছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পুরন্দর।

সব ভুলে যেতে চায় সে।

হাসি আসে—জীবনটা কেমন অসংখ্য ছোট-বড় পুতুলের ভিড়ের মতই। একবার দেখা হলে তো একসঙ্গেই থাকতে হবে তার কি মানে আছে! ছিটিয়ে ছত্রাকার হয়ে যায়। আবার দড়ির টানে কেমন সব জেগে ওঠে, নড়া চলা করে।

মাথাটা কেমন দুলছে। হাসে পুরন্দর।

—বেশ ভালো জিনিস তো হে বলরাম।

বলরাম জানে দলের অন্য কেউ এ খবরটা পেলে তাকে আর এখানেই থাকতে দেবে না। তবু ওস্তাদকে খুশী করা দরকার। তার হাতে থাকবে।

তাই এদিক-ওদিক দেখে একটু গলা নামিয়ে বলে—ভালো জিনিসই।

নিজে বাকীটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মুখটা মুছে নেয় বলরাম।

অবিনাশ অধিকারীকেও প্রথমদিকে এমনি করে হাত করেছিল, আবার পুরন্দরকে করবে। বেশ জানে বলরাম, একটু অভ্যস্ত হলে পুরন্দর তাকে ছাড়তে চাইবে না।

বলরামের অনুমান সত্যিই।

ক্রমশঃ বলরাম ধীরে ধীরে পুরন্দরের মনের অসহায় দুর্বল কোণটা বুঝে ফেলেছে, এবং সেইখানেই আঘাত দিতে থাকে।

এই পথের এই নিয়ম।

সেদিন বলে বলরাম ঃ

—মেলায় মেলায় যাদের ঘুরতে হয়, ঘর-সংসারও তাদের মেলাতেই।

পুরন্দর কথাটা বুঝতে পারে না।

—মানে ?

হাসে বলরাম ঃ

—এ তো সোজা কথা গো ! মানে বুঝলা না ? ঐ যে উরা—উরা তো মেলায় মেলায় সাথে সাথেই ঘোরে আমাদের সঙ্গেই।

ওই বাগানের অধিবাসীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলরাম। এইবার ওর কথাটা বুঝতে পারে।

পুরন্দর চুপ করে যায়। কথাটা ভাবছে পুরন্দর।

পরদিনই গিয়েছিল ওইখানে, ললিতাকে ভুলতে পারেনি। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। এত দিনের পরিচয়—ললিতা তাকে ফেরাতে পারবে না।

যদি মত বদলায় তার। নিজের এতদিনের ব্যাকুলতা আজ প্রকাশ পেতে চায়। আজ পুরন্দর নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। ঘর-বসত করতে

পারে। ললিতাকে তার কথাটা জানাবে। ললিতাকে দরকার হলে বিয়েই করবে সে।

ঘর-বসত করবে তারা। ললিতা এ-পথ ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে।

কিন্তু কথাটা শোনাবে কাকে? কেউ নেই সেখানে।

ওদের ঝুপড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। পাশের ঝুপড়ির কে যেন বলে ওঠে:

—সে তো চলে গেছে। বুড়ি, ললিতা কোন্ এক মানুষের সঙ্গে। সে তো ক'দিন আগেই গো!

—কোথায় গেছে?

ব্যাকুল পুরন্দর তবু খোঁজ করে। মেয়েটি খিলখিলিয়ে হাসে।

—মরণ! পাখীর আবার উড়বার ভাবনা! দেখছ না আসমান কত বড়, উড়ে গেল—ব্যস্! ফুরুৎ ধা—

পায়ে পায়ে সরে এল পুরন্দর। হাসির শব্দটা তখনও কানে আসে।

সব আলো যেন কালো হয়ে গেছে। দিনের বেলাতে শূন্য কঙ্কাল-সার মেলার সব নিঃস্ব কদর্যতা প্রকট হয়ে ওঠে। ঘেয়ো কুকুরগুলো মিষ্টির দোকানের এঁটো পাতার মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ বাধিয়েছে। তাদের কলরব আর চিৎকারে চারিদিক ভরে উঠেছে।

বলরাম এগিয়ে আসে। ও যেন পুরন্দরকে আস্তানার বাইরেই পেতে চায়। এই সুযোগই খুঁজছিল।

বলরামকে দেখে দাঁড়াল পুরন্দর।

মেলায় সবে বৈকালের আলো নিভে আসছে। রহস্যময়ী হয়ে উঠছে এর রূপ।

কেমন উদাস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে পুরন্দর। ভালো লাগে না তার।

বলরাম এগিয়ে আসে। ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠে:

—চলেন অধিকারী 'মশায়। একটু ঘুরে আসবেন।

—কোথায়?

বলরাম জানে বিভিন্ন আড্ডার খবর। অনেকদিন সে মেলার যাত্রী। বলে ওঠে—একটু খেলে ভালো লাগবে।

ইতস্ততঃ করে পুরন্দর। বলরাম বলে ওঠে—চলুন, এখুনিই ফিরবো।

পুরন্দর যেন বাধ্য হয়েই চলেছে।

এ মেলা থেকে ও মেলা—আবার অন্যত্র। এইভাবেই চলেছে পুরন্দর। বাড়িতে মাকে টাকা পাঠায়—দায়িত্ব খালাস। আবার এই আলো আর অন্য জগতে হারিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন মেলার ওই অঞ্চলে যায়, রাতের অন্ধকারে খোঁজে কাকে। ললিতাকে আজও ভোলেনি। তার খোঁজে ঘোরে ওই ঝুমরীর দলেব আশে-পাশে। এ খোঁজার আর শেষ নেই।

এত খ্যাতি-সম্মান কুড়িয়েও তাই পুরন্দর একজায়গায় নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে। নিঃস্ব হয়ে গেছে।

ললিতাকে আজও ভোলেনি।

দিন মাস কেটে গেছে, কেটে গেছে বছর।

আবার বাঁশবনে আসে নতুন সবুজ পাতার সমারোহ। ঘেঁটু-ফুলের গন্ধে উদাস হয়ে ওঠে বাতাস, পাখী ডাকে। সব সুরে আর রংয়ে মিলিয়ে আছে ললিতা তার—হারোনা কত দিন। পুরন্দর আজও তা ভোলেনি।

তাদের বাড়িটাও শূন্য।

ওদের পাড়ার কেউ জানে না কোথায় গেছে ললিতা আর তার মাসী। শুধু এইটুকুই জানে, ওরা কোথায় চলে গেছে।

পুরন্দর নিজের কাজে মন দেয়।

কিন্তু মন বসে না। মাঝে মাঝে ওই পাখীডাকা অপরাহ্ণে, লেবু ফুলের গন্ধভরা বাতাসে ভেসে আসে সেই হাসির টুকরো।

পুরন্দরের দলের নাম এখন চারাদকে।

দূর-দূরান্তর থেকে বায়না আসে। নতুন পালা তৈরির কথাও ভাবতে হয়। দলের ইজ্জৎ বজায় রাখতে হবে। এত ভিড়ের মাঝে একলা নির্জনে পুরন্দরের মনে বার বার ফিরে আসে তার কথা।

বর্ষার মুখ। ময়ূরাক্ষীর বন্যাবিরোধী বাঁধের সারি সারি তালগাছের মাথায় মেঘ নামছে। কোথায় ফুটেছে কদমফুল।

গ্রামে ফিরেছে পুরন্দর কয়েক মাসের জন্য।

এখন সে নামকরা লোক। দলের লোকরাও পয়সা পায়। নিজের বাড়িঘর বদলেছে। আঁচিল-পাঁচিল তুলেছে।

নেত্য কথাটা বলে প্রায়ই।

—বিয়ে-থা কর। ঘর-সংসারী হ' এইবার।

মায়ের কথায় হাসে পুরন্দর।

—সময় কই। তাছাড়া ঘর-বসতেব উপায় আছে? দিকদিগন্তরে ফেরি করার জীবন।

নতুন পুতুলনাচ আর পালাও লিখছে পুরন্দর।

এবার পালা হবে নবাব সিরাজদ্দৌলা। মুর্শিদাবাদের নবাবের কথা।

ন্যাড়া বলে ওঠে—একেবারে অপডুডেট পালা।

কথাটা শুনেছে বাবুদের কাছে—সবটা ভাল করে শোনেনি, বাকীটা তাই নিজের বুদ্ধি দিয়েই ভরাট কবে নিয়েছে। ভালো লাগে ন্যাড়ার।

মহা উৎসাহে সেই নতুন পালার আয়োজন করছে।

প্রথম খেলা দেখাবে এবার বক্রেশ্বরে শিববাত্রির মেলায়। তাবই তোড়জোড় চলেছে।

ইতিমধ্যে খবরটাও লোকের মুখে মুখে চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নাকি রক্ত-গরম করা পালা।

সিরাজদ্দৌলা পালা খোলবার মূলে রয়েছেন জানকীমাস্টার। ইস্কুলে ইতিহাস পড়ান। প্রায়ই মাঝে মাঝে পুলিসে ধরে নিয়ে

যায়। কখনও কিছুদিন ধরে কোথায় উধাও হন—আবার ফিরে আসেন। পুরন্দর তাঁর ছাত্র।

ঘর-সংসার করেন নি, বোর্ডিংয়ে থাকেন। সারা গ্রামের শ্রদ্ধেয় লোক।

জানকীবাবু প্রথমদিন পুরন্দরের পুতুলনাচ দেখে খুশী হন। কথা দেন—নতুন পালা করে দেব।

জনকীবাবুই ওই বুদ্ধি দেন। বলেন :

—রাজা-রাণী, রাম-লক্ষ্মণ এঁরা তো আছেনই; মানুষকে নতুন কিছু শোনা পুরন্দর। দেশের কথা—

পুরন্দর কি ভাবছে।

ঠিক পথ পায় না সে। ইচ্ছে করে তেমনি কিছু করবে, কিন্তু তেমন পালা-ই বা কোথা পাবে? তাছাড়া বাঁধনদার কই তেমন, যে দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ নিয়ে পালা বাঁধবে?

তাছাড়া এতে বিপদও আছে। মুকুন্দদাসের যাত্রার নামও শুনেছিল, দেখেছেও। রক্ত গরম হয়ে ওঠে। উদাত্ত কণ্ঠের সেই গান অনেকদিন নির্জনে প্রাণভরে গেয়েছে পুরন্দর। বুকে ভরসা পেয়েছে। জোর পেয়েছে।

—দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি।
কে পালাবে মা ফেলে॥

নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন জানকীবাবু। বইও দিয়েছেন অক্ষয় মৈত্রেয়ের সিরাজদৌল্লা। বাজেয়াপ্ত বই।

বলেন জানকীবাবু :

—সাবধানে পড়বি। এই দিয়ে কাজ হবে।

লুকিয়ে পড়েছে পুরন্দর রাত জেগে সেই বই।

চুপ করে ভেবেছে। অবাক হয়ে গেছে ও বই পড়ে।

এই যেন তার নতুন পথ। এতদিন যা করেছে তাতে বলবার কিছু ছিল না। নতুন পালা বাঁধতে বসে। এতে শোনাবার কথা আছে।

ন্যাড়া সব শুনে মেতে উঠেছে। উৎসাহ দেয়।

—ঠিক হ্যায় পুরোদা। লাগাও। চালাও পান্‌সী।

—জেলে যদি ধরে নিয়ে যায়? পুরন্দর বলে ওঠে—সে ভয়ও আছে রীতিমত কিন্তু, সব জেনে রাখা ভালো।

ন্যাড়া বলে—মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো! যাক না কোথায় ধরে নিয়ে যাবে। কি রে রামপদা! রাজী তো?

রামপদও সায় দেয়: হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল। শ্বশুরবাড়ি তো নাই—শ্বশুরবাড়িই দেখে আসবো তবু।

এরই মাঝে পুরন্দর নামোপাড়ায় দু'-একদিন সন্ধান করেছে।

ললিতা বা তার মাসী কেউ আর ফেরেনি। ওদের ঘরটা শুয়ে পড়েছে—ধবসে পড়েছে বর্ষার জলে।

পুরন্দর মাঝে মাঝে ভাবে—এত বড় পৃথিবীতে মানুষ হারিয়ে যায়। আর ফেরে না।

পাতা ঝরে, সবুজ পাতা হলুদ হয়ে যায়।

বাঁশবনে পাখী ডাকে। মাদারগাছে ফুল ফোটে—তেমনি উদগ্র সৌরভে ভরে তোলে চারিদিক।

এমনি পরিবেশে একদিন মিশিয়ে ছিল ললিতা, আজ সে-ও কোথায় হারিয়ে গেল এই জীবন থেকে।

নেত্য তবু কোট ছাড়ে না। মাঝে মাঝে তার শূন্য ঘরে মন টেকে না। আর পাঁচ জনের মত তার ছেলে সংসারী হোক এই সে চায়। এদিক-ওদিক খোঁজ করছে মেয়ের। আসেও অনেকে। ছেলের নাম-ডাক আছে। রোজকারও নেই তা নয়। তার জন্য পাত্রীর অভাব হয় না। মা-ও চাপ দেয় মাঝে মাঝে:

—মত দে বাবা। ঠিক-ঠাক করি তালে?

মায়ের কথার জবাব দেয় পুরন্দর—বিয়ে-থা হবে পরে। আগে দাঁড়াই। দেখছ না কি বাজার পড়েছে মা?

মা চুপ করে থাকে।

নিজের কাজে মন দেয় পুরন্দর, নতুন পালা নিয়ে পড়েছে সে।

শীতের শেষ। ওরা আবার বের হয় এবার দীর্ঘ পরিক্রমার পথে। রাঢ়ের প্রান্তে কোথায় কেন্দুবিল্ব বক্রেশ্বর—সেই দিকে। তাদের পথ লাল ধুলোয় ঢেকে আছে; ঘরের সীমানা সেখানে নেই। সেই পথে ঘোরে পুরন্দর। মাঝে মাঝে কোথাও শাল মহুয়ার ছায়া নামে সেই পথে।

ললিতা প্রথমে ভেবেছিল জীবনটা সহজভাবে ওদের নিয়ে কেটে যাবে। কিন্তু ভাবেনি যে অংশটা পচে গেছে, সেটা বাদ দিয়ে দেওয়াই ভালো। সেটা আর সেরে উঠে দেহের সঙ্গে মিশে যায় না।

অবিনাশ অধিকারী নতুন মেলায় দল চালাবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। বৈরাগীতলার মেলার সেই পরাজয়ের কাহিনী ফলাও করে এর আগেই এখানে এসে পৌঁচেছে। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে ডালপালা মেলে আরও অনেক কাহিনী। লোকটা নাকি অতি বদ।

খরচ করে সব গেড়ে বসেছে অবিনাশ।

ভাঙা দল। বেহালাদার নেই—বলরামও পলাতক।

তবু বাকী আর সবাইকে নিয়ে চেষ্টা করবে অবিনাশ।

কিন্তু দুর্বার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। ভেঙে পড়েছে।

যতই ভেঙে পড়েছে ততই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে মদ আর অনিয়মের স্রোতে অবিনাশ।

ললিতাই তাকে ফেরাবার চেষ্টা করেছে। লোকটার জন্য কেমন মায়া হয় ললিতার।

বর্ষা নেমেছে। তুমুল বর্ষা। রোজগারপাতি নেই।

রাঢ়ের প্রান্তরে মেলার মরসুম বন্ধ।

ললিতাদের নিয়ে এসেছে অবিনাশ তার গ্রামে। গঙ্গার ধারে পুরনো বাড়ি, শেওলা পড়েছে। ধ্বসে পড়েছে এক দিক। ছাদের ফাটলে জন্মেছে অশ্বত্থগাছ, যেন পোড়োবাড়ি একটা।

এককালে অবিনাশের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন ওই বাড়িটারই মত অন্তঃসারশূন্য। ভাঙন ধরেছে ওর অন্তর বাইরে।

বর্ষার উন্মাদ গঙ্গা খরস্রোতের আবর্ত তুলে এগিয়ে এসেছে বাড়ির দিকে। থৈ থৈ করছে জল চারি পাশে।

নতুন কোন দেশে ওই জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আশ্রয় পেয়েছে ললিতা। সে আশ্রয়ও তেমনি পলকা। চারিদিকের মাটিটুকু যেন জলে ধুয়ে যাবে।

কখন ধ্বসে পড়বে বাড়িটা, নাহয় গঙ্গাব স্রোতেব মুখে একরাশ মাটির সঙ্গে তলিয়ে যাবে কে জানে।

ললিতা স্তব্ধ দৃষ্টিতে গঙ্গার চরে ওই আধডুবো বাবলা গাছের দিকে চেয়ে থাকে। গলাজলে দাঁড়িয়ে পাটগাছগুলো মাথা নাড়ছে।

শোঁ শোঁ ওঠে জলের শব্দ।

ওরই মাঝে হারিয়ে গেছে ললিতার চিন্তার সূত্র। পুরন্দরকে মনে পড়ে। তাকে ভুল বুঝেই গেছে পুরন্দর। সব ছেড়ে যে আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছে ললিতা তার স্থায়ীত্ব কতটুকু জানে না।

কি যেন ভাবছে ললিতা।

মাসী গজগজ করে—এখানেও সেই অভাব আর অনটন। তাছাড়া পাড়াপড়শীর তীক্ষ্ণ জ্বালাধরানো কথাও শুনতে হয়।

সব সয়ে ললিতা তবু বাঁচবার চেষ্টা করে। এই নিয়ে খুশী থাকতে চায়।

জীবনের অতীত দিনের ভুলটাকে শুধরে নেবার চেষ্টা করে আপ্রাণ। মনোমোহিনীর এইটাই ভাল লাগে না।

মাসী বলে—অতিবড় ঘরন্তী না পায় ঘর। তোর ঘরের বড় নেশা লো! ছাখ ঘরের মজা।

অবিনাশ পড়ে থাকে ওই জীর্ণ ঘরে।

জানলা থেকে দেখা যায় গঙ্গার ওদিকে বিস্তীর্ণ চর ডুবে গেছে, জলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সাঁইবাবলার গাছগুলো। আউশ ধানের ক্ষেতে জল ছুঁয়েছে।

কালো মেঘ স্তরে স্তরে জমে উঠেছে। সব থেকে বৃষ্টি নামে।

বাতাসে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওঠে মত্ত নদীর শোঁ শোঁ গর্জন। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। চমকে ওঠে ললিতা।

মনে হয়, বাড়িখানা যেন নড়ছে ঝড়ের দাপটে।

মাসী ঠায় বসে আছে। অবিনাশ অধিকারী বেহুঁশ হয়েই থাকে, ক'দিন পেটভরে খাবারও জোটেনি। তার ওপর দারুণ জ্বর।

গায়ে যা দু'-এক ভরি সোনা ছিল তাও বেচেছে ললিতা, কিন্তু কোন দিকেই পথ পায়নি। সামনে আঁধার-ভরা রাতের মত দুঃখ আর অভাব পার হতে পারেনি।

বুড়ি বলে—পালাই চল ললিতা এখান থেকে।

ললিতা জবাব দেয়ঃ

—না। এ সময় যেতে পারবো না ওকে ফেলে।

মনোমোহিনী গজ গজ করেঃ

—তবে কি এই যমপুরীতে না খেয়ে মরবি? বাড়ি তো গঙ্গার জলেই যাবে। দেখছিস না?

রাতের অন্ধকারে শোনা যায় ক্ষুধার্ত গঙ্গার বুকে ধ্বসে পড়ছে মাটির স্তূপ, এক একটা আর্তনাদের মত শব্দ ওঠে।

ললিতা তবু ওই মানুষটাকে ফেলে যাবে না।

বুড়ির দু'চোখে কেমন দুর্বার একটা জ্বালা, কি ভাবছে সে। বাঁচার তাগিদে এতদিন সব করেছে, আজও পথ খোঁজে সে।

ললিতার বিশ্রী লাগে মাসীকে দেখতে, ও যে কোনদিন কাউকে ভালোবেসেছিল তা ভাবতেও পারে না। সরে এল ললিতা চুপ করে।

বৃষ্টি নেমেছে ক'দিন ধরে। নদীর জল এসে হানা দেয় বাড়ির দেওয়ালে। খানিকটা ধ্বসেও পড়েছে স্রোতের আবর্তে। ভয় করে ললিতার।

রাতভোর নদীর গর্জন বাতাস ভরে তোলে।

মনে হয়, যে আশ্রয় আর যে লোকটাকে কেন্দ্র করে সে এসেছিল, সে দুটোই জীর্ণ। কবে এক ফুৎকারে ছোট প্রদীপের মত সব নিভে যাবে কে জানে ?

ততই যেন নিবিড় করে ওই আশ্রয়টুকুকে পেতে চায় সে।

চারিদিক বৃষ্টির অঝোর ধারায় আর অতল অন্ধকারে ডুবে গেছে। রাত কত জানে না। বাতাসে স্রোতের গর্জন কানে আসে।

হঠাৎ মাসীর ডাকে বের হয়ে এল।

হ্যারিকেনের আলোয় দেখে ললিতা পড়ে আছে অবিনাশ অধিকারী। বিস্ফারিত দু'চোখ, স্তব্ধ হিমদেহ।

—মাসী !

মাসী ওর দিকে চাইল। কাঁদছে ললিতা।

চোখের সামনে মাসীকে দেখে স্থির অবিচল একটি মানুষ। কেমন যেন চমকে ওঠে ললিতা। বুঝতে দেরি হয় না।

আর্তনাদ করে ওঠে ঃ

—ওকে মেরে ফেললে ?

মাসী কঠিন স্বরে বলে—ধর্ ! পায়ের দিকটা ধর্ !

—মাসী ! আঁতকে ওঠে ললিতা।

বুড়ির শরীরে এসেছে কঠিন একটা শক্তি, ওর চোখের দিকে চাইতে ভয় হয় ললিতার। অবিনাশের প্রাণহীন দেহটা তুলেছে সে। এগিয়ে যায় ললিতা।

ঠাণ্ডা, কঠিন একটা স্পর্শ। অর্ধমৃত লোকটাকে গলা টিপে দিয়েছে। কাঁপছে ললিতা। লোকটার চোয়ালের ফাঁক দিয়ে তখনও রক্তের ধারা মুছে যায়নি। বাড়ির বাইরেই গঙ্গার স্রোত।

অন্ধকারে গঙ্গার তীব্র স্রোতের মুখে ছেড়ে দিল প্রাণহীন দেহটাকে—আর দেখা যায় না।

ফিসফিসিয়ে বলে বুড়ি—চল!

—কোথায়?

কোথায় যাবে জানে না ললিতা।

ললিতার হাতটা ধরেছে সে। টানছে তাকে বাইরের দিকে। পথের দিকে।

অন্ধকারে একটা প্রচণ্ড শব্দ ওঠে। বাড়ির ও-পাশের পাঁচিল ধ্বসে পড়ল গঙ্গার জলে—তখনও ধ্বসে পড়ছে ইঁট-কাঠ ঝুপঝাপ শব্দে।

ওরা দুজনে পথে নামল আবার।

ললিতার চোখের জল বাধা মানে না। সব আশা নিঃশেষে হারিয়ে গেল!

ঘর তার রইল না। ধ্বসে গেল, হারিয়ে গেল তার ভবিষ্যৎ। অবিনাশের প্রাণহীন দেহটা এখনও চোখে ভাসছে।

সেই সঙ্গে জীবনের অনাস্বাদিত একটু মধুর স্মৃতিও পরিণত হল ভীতিময় একটা আতঙ্কে। বুড়ি বলে চলেছে:

—শহরে যাবো, বহরমপুরে।

বৃষ্টির মধ্যেই মাঠ আর জলে-ডোবা পথ বেয়ে তারা এগিয়ে চলে পথ ধরে।

হু-হু ঝড় বইছে। গর্জন করে ওঠে বাতাস।

আঁধার পথে দুরু দুরু বুক কাঁপছে ললিতার।

মাসী যেন অন্য মানুষ।

হাঁটু জলের মধ্যে সোজা হয়ে এগিয়ে চলেছে তারা দুজনে।

এখান থেকে পালাতে পারলে যেন সে বাঁচে। পিছনের আতঙ্ক আর মনে রাখতে চায় না সে।

ইস্টিশানে এসে উঠল, রাত কত জানে না। ঘরের সীমানা আবার হারিয়ে গেল।

পথে পথে ঘোরার জীবন আবার শুরু হল তাদের।

শীতের কঠিন বাতাসে মহুয়াগাছের পাতা ঝরে গেছে। শালবনে এসেছে নতুন হলুদপাতার দল।

শালফুল ফোটে—বাতাসে ওঠে তারই সৌরভ।

লাল কাঁকুরে পথটা এসে শেষ হয়েছে মন্দির-প্রাঙ্গণে।

বক্রেশ্বরের মেলায় এসে পৌঁচেছে পুরন্দর।

চারিদিকে খবর রটে গেছে। মস্ত মেলা—শুকনো নদীর ধারে পড়েছে ওদের আসর। সবে বাস চলতে শুরু হয়েছে এ পথে, তাই যাত্রীর অভাব নেই। কাতারে কাতারে লোক আসছে।

শিউড়ি-দুবরাজপুর থেকে আসছে যাত্রীদল। কেমন ঝকঝকে নতুন গাড়িগুলো। জোরে দৌড়ায়।

রামপদ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বলে ঃ

—কলকব্জা কত উঠছে গো! মানুষ তো লয় যেন পক্ষীরাজ। এই শিউড়ি—ব্যস্, হুস্ করে একেবারে বক্কেশ্বর।

ন্যাড়া কলের গানও লাগিয়েছে। তারই বা কলকব্জায় কমতি কি। বড় টর্চও কিনেছে ফোকাসের জন্য। কারবাইড গ্যাসের ফোকাসেও নানা রঙের কাঁচ লাগিয়েছে। তাই দিয়ে আলোর খেলা জমায়।

যুদ্ধের সিনে কামানের আওয়াজ করেছে—গন্ধক পটাশ মিশিয়েছে। সেই সঙ্গে আসর ভরে দেয় ধুনোর ধোঁয়ায়। সবুজ আলো পড়ে সব কেমন বিচিত্র দেখায়। মুগ্ধবিস্ময়ে দর্শকরা চেয়ে থাকে।

'সিরাজদ্দৌলা' পালা বেঁধেছে—তৈরিও করেছে। তেমন দর্শক পেলে তবে করবে।

লোকেও শুনেছে সে কথা। মেলা-কর্তৃপক্ষও অনুরোধ জানিয়েছে। বাড়তি দুশো টাকা দেবে দরকার হলে। হাসে পুরন্দর।

—আজ্ঞে, টাকার চেয়ে যাঁনারা দেখবেন তাঁরা খুশী হলেই সব পাওয়া হবে আমার। দেখি—আসর বুঝে পালা নামাবো।

স্বদেশী যুগ।

বাবুরা, ইস্কুলের ছেলেরাও মনে মনে আজ জেগে উঠেছে। এখানে-ওখানে পিকেটিং, ধরপাকড় চলেছেই চলেছে। হাওয়ায় অন্য সুর ওঠে।

পুরন্দরও সেই হাওয়ায় যেন উধাও হতে চায়। শুধু ঠাকুর-দেবতার কথা নয়, মানুষের কথা, দেশের ইতিহাসের কথা শোনাতে চায়।

দেখাতে চায় কি করে বিদেশী বণিক তাদেব স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে।

তেমনি আসরে এ পালা প্রথম দেখাবে।

পুবন্দর কি ভাবছে।

একটা ভাবনার কথা। দলেব পক্ষে খুবই ভাবনাব কথা, অন্যদিকে আবার সম্মানও কম নয়। পুতুল-নাচিয়ে শুধু সে নয়, দেশকে ভালবাসে তাই জানাবে সেই কথা।

বাত্রি নেমেছে। বলরাম যথারীতি এসে জুটেছে আবার।

তবে ওব ব্যাপারটা টেব পেয়েছে ন্যাড়া। খুব নজবে রাখে। তাই বলবাম যুং করতে পাবে না। পুবন্দবের পিছনে পিছনে ঘোবে। পুবন্দরেবও ইচ্ছে হয়—মেলায় এলেই ওই পানীয়ের তৃষ্ণা জাগে। কেমন আনচান করে মন। কিন্তু উপায় নেই। ন্যাড়ার সবদিকে নজব। তাকে পারা যায় না।

পুবন্দব অভ্যাসমতই মেলা দেখতে বেরিয়েছে।

তীর্থস্থান। পীঠস্থান এই বক্রেশ্বর। দুধকুণ্ড, বৈতরণী, উষ্ণ প্রস্রবণ—সবকিছু এখানকার মাহাত্ম্য। পুবনো মন্দির আর অষ্ট-কুণ্ডেব মহিমা এখানে জাগ্রত। তাই যাত্রীরা আসে পুণ্য করতে আর মেলা দেখতে।

তেমনি ভিড়ও জমেছে। তীর্থদর্শন আব মেলা দেখা একসঙ্গে দুই কাজই হবে। যাত্রীর দল আসছেই।

রাত নামে, পুরন্দর একাই মেলার বাইরে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল।

তারা-জ্বলা আকাশ। অনেকদিন পর একটু খেয়েছে। ওই পানীয়ের অভাব এখানে নেই। তীর্থস্থানের সাধনার ওটা উপকরণ। আজ মনটা কেমন আনমনা হয়ে পড়েছে।

আকণ্ঠ পান করেছে পুরন্দর। বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে বেশী পান করার দরুন পা দুটো টলছে। দাঁড়াবার উপায় নেই। মনের সেই রুদ্ধ কামনার জ্বালা অমনি তারা-জ্বলা অন্ধকার ফুঁড়ে হাজারো বেদনার্ত মূক ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করতে চাইছে।

কিন্তু একটা জায়গায় সে নিদারুণভাবে ব্যর্থ—হেরে গেছে সে। মদ খায় সেই কথাটা ভুলতে, কিন্তু নেশা হলে সেটা যেন আরো বেশি করে মনে পড়ে।

ললিতাকে হারিয়ে ফেলেছে—ললিতা তাকে ছেড়ে গেছে। পুতুল-নাচের সাধনায় যে প্রাণ আনন্দ সে তার পাশে থেকে পেয়েছিল আজ তা নেই। শুধু অভ্যাস আর হাহাকার-ভরা মন এরই মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়। তাই ঘোরে মেলায় মেলায় যাযাবরের মত, আর পুতুল নাচায়।

মাঝে মাঝে এখনও মনে হয় কে যেন হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াবে, তার সেই হারানো ললিতা; হারানো মধুময় অতীত। কিন্তু তা হয়নি।

শুকনো নদীর বুকে বালিয়াড়িটা জেগে আছে আঁধারে রূপোর পাতের মত। কেমন একটু সাদা আভাস। দূরে কোথায় একটা চখা ডাকছে। তার উদাস সুর পেছনে মেলার কলরব ছাপিয়ে উঠেছে আকাশে।

ওদিকে আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ঝুপড়ি। মহুয়াগাছের নীচে ওরা আঁধারে-আলোয় একটা রহস্যময় পরিবেশে টিকে আছে নীরব একটি প্রশ্নের মত।

হঠাৎ কাকে মেলার দিক থেকে যেতে দেখে একটু দাঁড়াল। নেশায় চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে তবু চেয়ে দেখে সে। এ তার চেনা বলেই মনে হয়।

চমকে উঠে পুরন্দর। সেই চলন—দূর থেকে দেখেও চিনতে অসুবিধা হয় না। ওর সারা মন একসঙ্গে নাড়া দিয়ে ওঠে।

—ললিতা!··

অন্ধকারের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ললিতা ওই জড়িতকণ্ঠের ডাক শুনে।

এগিয়ে আসছে পুরন্দর। কেমন বুক কাঁপে ললিতার।

ওই জীবন, ওই স্মৃতি, ওই মানুষগুলো—সবকিছুই সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে—ফেলতে চায়। বার বার ভেবে দেখেছে, মন বলে যে পদার্থ—সে শুধু পিছনের সবকিছু টেনে কুড়িয়ে চলতে চায়; সে-ই যত গোল বাধায়।

বার বার আঘাত আর আঘাতে তার বাস্তব জগতের সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে। কি হবে মনের ওই দুর্বলতায়!

সে-ও তো নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল। বাবা, মাসী আর তার ঘর—সব নিয়ে। কিন্তু কি পেয়েছে?

কিন্তু নিদারুণ একটা বেদনাদায়ক সেই ব্যর্থ চেষ্টার স্মৃতি আজও ভোলেনি ললিতা।

মাসীকে ও দেখেছে। এ যেন আর একজন মেয়ে। অতীতে একদিন ভালোবেসেছিল—ঘর বাঁধতে চেয়েছিল তার স্বামী আর ললিতাকে নিয়ে। কিন্তু তার চিহ্ন কোথাও নেই।

জীবনে তার ব্যর্থ বেদনা আর শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার মাশুল দিয়ে গেছে অবিনাশ মূলগায়েন। অন্ধকার বৃষ্টিঝরা রাত—গঙ্গার উন্মাদ স্রোত বয়ে চলেছে, ধ্বসে পড়ছে বাড়িখানা ওর অতল গহ্বরে।

বুড়ির সেই রাত্রের দু'চোখে হিংসার আর হত্যার কালো ছায়া সে দেখেছিল; বাঁচবার জন্য, শুধু টিকে থাকার জন্য অবিনাশ অধিকারীকে ও সরিয়ে দিয়েছে, যাকে ভালোবাসতো অতীতের সেই মানুষটিকে ও নিঃশেষে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি।

আর প্রেম—ভালোবাসা!

শুধু বেঁচে থাকার কাছে এর দাম কতটুকু তা, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ললিতা অনেক দুঃখের মাঝে।

তাই জীবনটাকে আর কোন বাঁধনে জড়াতে চায় না আজ ললিতা।

পুরন্দর যে অতীত ছিল—সেই অতীতই থাক। আজ তাতে কোন সান্ত্বনাই পাবে না ললিতা। তবু পুরন্দর এগিয়ে আসছে, ললিতাও যেতে পারেনি।

হাজারো মানুষ মদ্যপ সহজ—সব অবস্থাতেই তার কানের কাছে শোনাতে চেয়েছে ভালোবাসার কথা রাতের পর রাত। ঘেন্না ধরে গেছে ওই পুরুষজাতটার উপর ললিতার। পুরন্দর তাদেরই দলের, ওদেরই একজন।

আজ ভাবতে পারে—মাসী কত দুঃখ বেদনা আর জ্বালায় সেই রাতে ওই পথ নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আজ জীবন ঠিক সেই প্রশ্ন নিয়েই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুরন্দর এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

হাসছে ললিতা। সব দুর্বলতাটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে।

খিলখিল করে হাসছে। আঁধার রাতে, তারার আলোয় তার নধর পুরুষ্ট দেহটায় যেন কামনার বান ডেকেছে।

ওর হাতটা হাতে তুলে নেয় পুরন্দর।

বাধা দিল না ললিতা। ওকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ক' বছরেই অনেক বদলেছে পুরন্দর। আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ললিতা একটু অবাক হয়—ওর মুখে মদের তীব্র গন্ধ। পা-দুটো টলছে। হাসিভরা কণ্ঠেই ললিতা বাহবা দেয়।

—ক' বছরে বেশ লায়েক হয়ে উঠেছ দেখছি।

পুরন্দর ওকে দেখছে। ওর হাসির শব্দ আর সহজ কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা ভরসা পায়। আগেকার দিন—সেই প্রথম সন্ধ্যার স্মৃতি তার মনে সাড়া তোলে।

—ললিতা!

—বল।

পুরন্দর কাছে এগিয়ে এসেছে।

—কোথা ছিলি এতদিন? কত খুঁজেছি তোকে!

ললিতার মনে আগেকার সেই সুর জাগে। জীবনের এত কঠিন রূপের মাঝে মন কিছু পেয়ে, কিছু দিয়ে বাঁচতে চায়। ওর স্পর্শে সেই কামনা আর অপরিচিতের হিংস্র লালসাটুকুই বড় হয়ে ওঠেনি।

আরও কিছু আছে যা তার মনকে নাড়া দেয়। ঝড় তোলে। ললিতার এতদিনের দেখা জীবন-দর্শন যেন বদলে যাবে।

তার পুরন্দর আজও খুঁজে ফেরে তাকে।

একটু জ্বালাভরা সুরেই বলে ওঠে ললিতা:

—ওহ ছাইপাঁশ গিলেছ দেখছি। এ পথে এসে সবই শিখেছ?

চুপ করে থাকে পুরন্দর।

রাতের বাতাস হু হু বয় শূন্য প্রান্তরে। দূরে শালবনে যেন ঝড় তুলেছে। ওরই অসীমে ললিতাও হারিয়ে যাবে।

পুরন্দর অনেকদিন পর দেখছে ওকে। মনে একটা নীরব সুর জাগে, এতটুকু ভয়ও। আবার যেন রাতের তারার মত ও দিনের আলোয় হারিয়ে যাবে।

পুরন্দর বলে ওঠে—বড্ড একা একা মনে হয়। তাই ভুলে থাকবার জন্যেই এইসব ধরেছি। একটা কিছু অবলম্বন তো চাই। আর কিছুই তো পাইনি।

আজ ললিতা ওকে নতুন করে দেখে।

পুরন্দরের কণ্ঠস্বরে সেই নিবিড় আন্তরিকতা। ওকে কাছে টেনে নেয়। বলে ওঠে:

—ঘরে চল, গাঁয়ে ফিরে চল ললিতা। সেখানে আমরা শান্তিতে থাকবো আবার।

হাসে ললিতা। এত অবিশ্বাস আঘাতের পরও মন আজও ঘর

চায়—ভালোবাসতে চায়। শুকনো বন্ধুর পৃথিবীতে এখনও সব সবুজ নিঃশেষ হয়নি। তাই আশা জাগে।

—ভাবছি! ললিতা ফিসফিসিয়ে একান্ত গোপনে ওকে কথাটা শোনাতে চায়। ওর নিবিড় বাঁধনে নিজেকে সঁপে দিয়ে মনের বোঝাটা কমাতে চায় সে। পুরন্দরও সায় দেয়।

—তাই ভাব।

ললিতা ওর মুখে গালে নরম হাতটা আদরভরে বোলাতে থাকে। সব মনের দৃঢ়তা যেন ভেঙে আসছে। এই ছিল তার সবচেয়ে বড় চাওয়া।

হালকা একরাশ চুলের স্পর্শ ওকে স্বপ্নময়ী করে তোলে। প্রশ্ন করে ললিতা :

—খেলা দেখাবে না আজ ?

চমকে ওঠে পুরন্দব। কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিল না। ভুলে গিয়েছিল কথায় কথায়। ব্যস্ত হয়ে ওঠে পুরন্দর।

—হাঁ, দেরি হয়ে গেল। তুই আসবি তো ? নতুন পালা ধববো আজ। ললিতা, তোকে দেখাবার জন্যই আজ নতুন পালা হবে। আসবি তো ?

ললিতা সাড়া না দিয়ে পাবে না এই ডাকে। পুরন্দরকে কথা দেয়।

—যাবো। অনেকদিন তোমার পালা দেখিনি।

আঁধারে মিশিয়ে গেল পুরন্দর। মেলার দিকে চলে গেল। অন্ধকাব থেকে আলোর দেশে হারিয়ে গেল পুরন্দর। ডাক দিয়ে গেল তাকে ওই আলোর দিকে।

ললিতা হঠাৎ পিছনে ফিরেই দেখে বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে আলোর মাথায় একটা আকন্দগাছের ঝোপের পাশে। অনেকক্ষণ না দেখে তাকে খুঁজতে বের হয়েছিল। আঁধারে গলা শুনে এগিয়ে এসেছে বুড়ি। কেমন যেন চমকে উঠেছে বুড়ি ললিতার কথা শুনে।

এতদিন পরও ললিতার সেই সর্বনাশা ঘরবাঁধা মন বেঁচে আছে। এত দেখেও ওর চৈতন্য হয়নি। ভোলেনি দুজনে দুজনকে।

পুরন্দরের কথাগুলোও শুনেছে বুড়ি।

ললিতা জানে না—বুড়ি জানে, জীবনের বহু মূল্য দিয়ে জেনেছে কি ওর দাম! অবিনাশ অধিকারীও তার চেয়ে কম ছিল না। মনোকে সে রাণী করে দিয়েছিল। কিন্তু ওরা যাযাবরের জাত—এক ঠাঁই মন বসে না ওদের। আজ আশা দিয়ে নিয়ে যাবে—আবার কবে সে ঘর পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে পালাবে কেউ জানে না।

অবিনাশ অধিকারীকে ভোলেনি বুড়ি। ওরা সবই এক জাতের।

ওদের জন্য কোন ঘর নেই—শান্তি নেই। নিজেরা জ্বলবে—অপরকেও জ্বালাবে।

ওর শেষের পরিণতিটা আজও ভোলেনি।

তবু দেখে-শুনেও ললিতা বদলায় না—বয়স আর মন একটা জায়গায় ভুল করেই আনন্দ পায়, দুঃখ পাবার জন্যই আগুনে হাত দেয় সেই বয়সে। বুড়ি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে ঃ

—কি বলে গেল ছোঁড়া? চাঁদ ধরিয়ে দেবে নাকি তুকে?

ললিতা কথা না বলে ঘৃণাভরা চোখে মাসীর দিকে চেয়ে থাকে।

বুড়ি বলে চলেছে—ওসব ছেঁদো কথায় কান দিস না ললিতা। আমিও দিয়েছিলাম, এখন জ্বলে-পুড়ে মরছি। আবার তুইও সেই ভুল করবি?

—মাসী! ললিতা ও-কথা শুনতে চায় না।

বুড়ি থামল ললিতার ওই ধমকে।

ললিতা বলে ওঠে—এসব ব্যাপারে তুমি কথা বলো না। যা ভালো বুঝবো করবো আমি।

বুড়ি বলে ওঠে ঃ

—ওই তো করেছিলি! ঘর! কালামুখী সে ঘরও তো মা-গঙ্গায় ধ্বসে গেল। পাপ—পাপে ডুবে আছিস, তাতেই থাক। ঘর বাঁধবার পুণ্যি আমাদের নাই। জ্বলে পুড়ে মরবি।

বুড়ি কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে পড়ে।

বয়স হয়েছে। তবু কোনমতে দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবে সেই ঝুপড়ির দিকে। ওখানে রাতের অন্ধকারে শ্মশানপ্রেতের দল আর ঘেয়ো কুকুরগুলো ভিড় করেছে। বাতাসে মদের ঝাঁঝালো গন্ধ আর ওদের কলরব ওঠে। যাবাব মুখে দাঁড়াল বুড়ি। দেখছে ওকে।

ললিতার মনে সুন্দর একটি আলোক-স্বপ্ন। ওই জগতকে সে ঘৃণা কবে তাই অন্য কোথাও বাঁচতে চায়।

কোন নিষেধ সে মানবে না।

দুর্বার একটি মনের নিঃশেষে ভালোবাসার সুরে সব বাধা দ্বিধা অনিশ্চয়তা ভেসে গেছে। সে আবার পথ পেয়েছে। বাঁচার পথ।

আবার গ্রামে ফিরবে। সেই সবুজ পরিবেশে। দীঘির ওপারে ময়ূরাক্ষীতে নামবে বর্ষার গেরুয়া ঢল। আকাশ কালো করে দেখা দেবে পুঞ্জ মেঘ ; পাখী ডাকবে ওদের বাড়িব সামনেব নিমগাছে। গাছে পাতায় বর্ষা মেঘের শান্ত স্পর্শ।

ডানা ভিজে—পাখীগুলো ঠুকবে পালক শোকাবে নিশ্চিন্তমনে। পাংশু আকাশে আবার বৃষ্টি নামবে।

পুরন্দর তাকে একটি তেমনি জীবনেব ইশাবা দেখিয়েছে। সেই শান্ত মধুময় জীবনের একটি ঘরেব স্বপ্ন এনেছে।

বুড়ি বলে—মাঝে মাঝে তোব কি হয় বলদিকি ?

এই আনমনা ভাব যেন ললিতাব মনে ঝড়ে তোলে। বুড়ি জানে ঘরের নেশা ওর স্বাভাবিক। তাই তাব আশ্বাস ললিতাকে ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু বুড়ি জানে—ও-ঘর চোরাবালির উপর।

—মাথার পোকা নড়ে। জবাব দেয় ললিতা।

বুড়ি বলে ওঠে—তাই দেখছি। পরে বুঝবি এর জ্বালা কি !

ললিতা ওর দিকে চেয়ে থাকে। যেন ওর কথাগুলো কান দিয়ে শুনছে।

বুড়ি তাকমত শোনাতে থাকে :

—ওসব মন, আশা—ওগুলো ছাড় ললিতা। পাথরে দাগ কাটে না —দাগ কাটলেই তাতে ফাটল ধরে। মানুষের ভিতরে ঢুকিস না লো—বাইরে বাইরে এল ফিরে গেল এইটুকুই যথেষ্ট। চোখের কাজল যদি পাতায় বসে থাকে চোখ কানা হয়, তাইতো চোখের জলেই ধুয়ে যায় ও কাজল।

ললিতা এগিয়ে আসছে নদীর ধার থেকে ওদের আশ্রয়ের দিকে।

মনে তার হু হু ঝড় উঠেছে। এলোমেলো কি ভাবছে।

সেই ঝড়ো অন্ধকারে পথ খুঁজছে। বুড়ি গজ গজ করে : মরণদশা! আর্সুলার ডানা গজিয়েছে আর কি! ললিতা কোন কথার জবাব দিল না। বুড়ি ফিরে চলেছে ঝুপড়ির দিকে বিরক্তি ভরে।

পুরন্দর আজ খুশীমনে ফিরে গেছে। বহুদিন পর আবার সেই আগেকার মন ফিরে পেয়েছে। সেই উৎসাহ আর উদ্যম। নতুন মন নিয়ে খেলা দেখাবে আজ।

চারিদিকে লোক জমে গেছে পুতুলনাচের আসরে। নামকরা পুতুলনাচিয়ের দল। তাই দর্শকও আসে ভিড় করে।

ভদ্রলোকও অনেক এসেছেন। মেলার যাত্রী-বোঝাই বাস আসে, শহরের অনেক লোকজন ভদ্রলোকের ভিড় জমে। ন্যাড়া সেই গেটে নহবত বসিয়েছে।

নতুন পালা শুরু হবে আজ। তাই অনুষ্ঠান একটু জমজমাট।

বহুদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা সেই নতুন পালা—সিরাজদ্দৌলা। সেই পালাই মঞ্চস্থ করবে আজ পুরন্দর।

চমকে ওঠে ন্যাড়া—পুরোদা! তাহলে ওইটাই লাগাবো?

পুরন্দর আজ বুকে বল-ভরসা পেয়েছে। একজনের প্রীতি আর নিঃশেষ ভালোবাসার অমূল্য সম্পদস্পর্শ তার মনে।

পুরন্দর বলে ওঠে—হ্যাঁ, ওই লাগাবো। দেখছিস, কেমন সব লোকজন এয়েছেন। আজই হয়ে যাক প্রথম আসর বাবা বক্কেশ্বরের থানে। বুড়ো বাবার রাজ্যে।

ভিড়ের মধ্যে কাকে খুঁজছে পুরন্দর।

অগুণতি মাথা আর দর্শকের ভিড়। তারাও উসখুশ করছে কখন খেলা শুরু হয়। কলের গান বাজছে। একটা সুর ওঠে। হঠাৎ পুরন্দরের চোখ পড়ে ললিতার উপর। সে এসেছে।

একবার চমকে ওঠে, ললিতা—হ্যাঁ, তার ললিতাও এসেছে। দু'চোখের তারা একবার ওর চোখে পড়ে। কেমন একটা বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করে পুরন্দর।

ললিতা কথা রেখেছে। দেখতে এসেছে তার খেলা। পুরন্দর আজ তার সেরা পালা নামাবে ওকে দেখাবার জন্যই। ন্যাড়াও তৈরি হয়েছে।

পালার নাম ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সংবর্ধনাসূচক হরিধ্বনি ওঠে। কেউ বা হাততালি দেয় খুশী হয়ে।

গমগম করে ওঠে আসর। বন্দনাগানের সুর ওঠে—

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার,
আমার দেশ।
কেন গো মা তোর মলিন বসন,
কেন গো মা তোর ছিন্ন বেশ॥

আজাহার, ন্যাড়া, রামপদ—সকলের সুরেলা গলা ভেসে ওঠে। বেহালাদার চোখ বুজে সুরে ছড়ি টানছে। আজাহার ঘোষকের কথাগুলো বলে চলে।

বাংলার বুকে এল ইংরেজ—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে
পোহালে শর্বরী॥

ন্যাড়া জানকীমাস্টারের সব কথাগুলো, উদ্ধৃতিগুলোই কাজে লাগিয়েছে সুন্দরভাবে।

মুগ্ধ জনতা বেদনায় আর আনন্দে দেখে চলেছে নতুন ধরনের পুতুলনাচ। নতুন দিনের কথা। তারা যা লোকমুখে ছেঁড়া ছেঁড়া

শুনেছিল, তা সম্পূর্ণ একটি বলিষ্ঠ নাটকের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আজ তাদের সামনে।

কামানের শব্দে কাঁপছে বনভূমি—নিহত মোহনলাল, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা সিরাজ আজ অসহায়। পলাতক। ইংরেজ চক্রান্ত করে বাংলাকে গ্রাস করছে।

চোখ দিয়ে জল বের হয়ে আসে অতীতের একটি পরম মহূর্তের ব্যর্থতায়।

ওই হাজারো দর্শককে পুরন্দর শতাব্দীর পারে এক দুঃখভরা ইতিহাসের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

ললিতার বুক ভরে ওঠে আনন্দে, সার্থকতায়।

চোখের জল মোছে সে। তন্ময় হয়ে দেখছে পুতুলনাচ।

তার পুরন্দর হারায়নি। আজ সারা দেশের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটি বলিষ্ঠ চেতনার প্রতীক হয়ে তার পুরন্দর।

আজ কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে ললিতা।

পুরন্দরকে সার্থক করে তুলবে। নিজেও সুখী হবে। কারও কোন কথা শুনবে না। একজন ভুল করেছিল। ভুল করেছিল অবিনাশ অধিকারী। পুরন্দর নিশ্চয়ই সে ভুল করবে না। অবিনাশ শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে—তার জন্য সে দায়ী, দায়ী তার মাসীও।

আজ পুরন্দর ললিতা সে ভুল আর করবে না। তারা সুখী হবে।

পুরন্দরকে মেনে নেবে ললিতা।

পালা শেষ হয়ে গেছে কখন ললিতা খেয়াল করেনি।

ওদের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

প্রশংসামুখর লোকজন উঠে পড়েছে।

কলরব করে বের হচ্ছে জনতা। তারা খুশিতে ভরে উঠেছে। শহরের বাবুরা ভিড় করে ধরেছে পুরন্দরকে। কি সব কথাবার্তা কইছে। ললিতা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরন্দরকে দেখছে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে।

হঠাৎ কাদের ঢুকতে দেখে সকলেই অবাক হয়।. পুলিস এসে গেছে। পুরন্দর জানতো—আশঙ্কাও করেছিল এমনি একটা কাণ্ড বাধবে৭ এই পালা দেখানোর পর ওরা ছেড়ে কথা কইবে না। এর জন্য শাস্তি তাকে পেতে হবে। তবু জানকীবাবুর কথা ভোলেনি। তিনিই বলেছিলেন তাকে ঃ

—এ তোকে করতেই হবে পুরো। এতবড় দুর্দিনে তুইও এই কথা লোককে শোনাবি। দেশ-জাতিকে জাগাবার কাজ করবি। বিদেশীরা তাতে বাধা দেবে—একথা জেনেও।

ওরা এগিয়ে আসে—আপনি পুরন্দর সূত্রধর ?

—আজ্ঞে।

একজন পদস্থ কর্মচারী এগিয়ে এসে বলে ওঠেন ঃ

—সদরে যেতে হবে আপনাকে। আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত এ বই কোথাও দেখানো চলবে না।

ওকে নিয়ে যাচ্ছে। ন্যাড়া অবাক হয়ে যায়।

—পুরোদা !

পুরন্দর হাসে—দল ততদিন তুই চালাবি ন্যাড়া যতদিন না ফিরে আসি।

ললিতা এগিয়ে এসে ওর পথে দাঁড়িয়েছে।

ললিতাকে দেখে অবাক হয় পুরন্দর।

কাঁদছে সে। একবার ওর দিকে চাইল। ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একটি মেয়ে। কেউ তাকে চেনে না। দেখেও না। ওরা সবাই দেখে পুরন্দরকে।

পুরন্দর বিজয়ীর মত মাথা উঁচু করে চলেছে। দু'পাশে হাজারো লোকের জনতা তাকে অভিনন্দন জানায়। ললিতা চুপ করে তাই দেখছে। চোখে তার জল নেমেছে।

কারা ধ্বনি তোলে—বন্দেমাতরম্ !

পুরন্দর আজ সবচেয়ে বড় সম্মান কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

অন্ধকারেই একটা বাসে চাপিয়ে সদরের দিকে চলে গেল তারা। ভিড় হালকা হয়ে আসে। পিছনে পড়ে রইল আলো-ঢাকা মেলা—লোকজন। আঁধারে চলেছে ওরা।

ক্রমশঃ জনহীন হয়ে আসে পথ।

স্তব্ধ আঁধার নামে—তারা চলে সেই নির্জন পথে।

উত্তাপ, উৎসাহ, ভিড়—সব মিলিয়ে যায়।

পুরন্দর একাই চুপ করে বসে কি ভাবছে গাড়িতে।

মেলার আসর সে একাই জয় করেছে। দেখেছে ও পালা-গানে নিজেও কত উৎসাহ পেয়েছে, ওই পালাই দেখাতো এ-বছরের সব মেলায়, কিন্তু এরা তা দেবে না।

শালবনের ভিতর দিয়ে গাড়িটা চলেছে, দুটো হেডলাইটের আলোয় আঁধার বিদীর্ণ করে। ওকে সদরে নিয়ে চলেছে।

পুরন্দর আনমনে কি ভাবছে।

একজনকে বার বার মনে পড়ে, সে ললিতা।

ললিতার কান্নাভেজা মুখটা মনে পড়ে। কত দূরে যেন সরে গেল সে। এত কাছে এসে আবার কোথায় হারিয়ে গেল পুরন্দর।

সব হারিয়ে গেল তার!

কান্না থামে না ললিতার।

চলে গেল পুরন্দর। জোর করে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল ওকে কোন্ নিষ্ঠুর নিয়তি।

তখনও জটলা চলেছে, সারা মেলায় খবরটা রটে গেছে। কাতারে কাতারে লোক জমেছে এখানে-ওখানে।

একাই ভিড় ঠেলে বের হয়ে এল ললিতা।

বুড়ি তখনও জেগে বসে আছে। কথাটা এতদূর অবধি এসে পৌঁচেছে হাওয়ায়। শুনে খুশীও হয়েছে সে। ললিতাকে ঢুকতে দেখে বলে ওঠে:

—পাপ গেল তাহলে! বাঁচা গেল।

—মাসী!

হাসে বুড়িঃ গলায় মালা দিয়ে বরের মত গাড়ি চেপে গেল, কই দেখতে পেয়েছিল তোকে? কথা বলেছিল?

চুপ করে থাকে ললিতা। তখন কথা বলা সম্ভব ছিল না। নইলে তাকে দেখেছে। নীরব চাহনিতে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ। কথাও বলতো। ললিতা বলে ওঠে—যা ভিড়। সারা মেলা ভেঙে পড়েছে ওকে দেখতে।

বুড়ি বলে ওঠে—ছাই! পাঁচজন লোকের সামনে এঁটো পাতার দিকে চাইতে ইজ্জতে বাধে, তাই ওরা রাতের অন্ধকারে ঘুরঘুর করে আর মিষ্টি কথা শোনায় তোদের। কুকুরের জাত ওগুলো। মানুষ না। বুঝেও বুঝিস না লো।

ললিতা কথা বলে না। বার বার আঘাত খেয়ে মনে হয় তার ভাগ্যে সেই নরকবাসের ব্যবস্থাই পাকা হয়ে রইল। একবার ঘর বাঁধতে গিয়েছিল। গঙ্গার স্রোতে সেই ঘর ভেঙে গেছে। তবু থামেনি ললিতা। চেষ্টা করেছে আবার একটি ঘর ফিরে পাবার।

আজ আবার নিয়তির অমোঘ নির্দেশে সব হারিয়ে গেল। কান্না আসে। হতাশা আর দুঃখে কাঁদছে সে।

—খাবি টুকচেন? দেখ, ভাল লাগবে।

বুড়ি ওর সামনে গেলাসটা ধরে।

কেমন ঝাঁঝালো একটা গন্ধ। সারা শরীরটা ক্লান্তি আর হতাশায় ভেঙে পড়েছে। হাত কাঁপে। মনে কেমন ঝড় বইছে, ললিতাকে যেন কোন অন্ধকার শূন্যে উধাও করে নিয়ে যাবে। অবিনাশের ঘর, তার বাবা, পুরন্দরের সেই আকুতি, প্রীতি আর ভালবাসার স্পর্শ, সব হারিয়ে গেছে বারবার। তার কোন পথ নেই।

শক্ত হাতে আবার গেলাসটা ধরে ললিতা। গলার মধ্যে উজাড় করে ঢেলে দেয়। গলা-বুক জ্বালা করে ওঠে।

ওই চিন্তাগুলো জমাটবাঁধা পাথর, ক্রমশঃ গলছে—হাল্কা হচ্ছে। মনের ভিতর একটা আঁধার ভাব নামে। বুক, গলা তখনও জ্বলছে।

জ্বলুক! তবু মনটা কেমন স্থির হয়ে আসে।

উতরোল মনের কাঁপুনি থামে। থরথর কাঁপুনি।

বুড়ি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

নিজের অতীতের কথাগুলো মনে পড়ে। এমনি বিপাকে সে-ও পড়েছিল। কত আশা আর স্বপ্ন দেখেছিল সে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে। অবিনাশ অধিকারী তাকেও ভুলিয়েছিল।

মেলায় মেলায় গড়ে উঠেছিল তাদের পরিচয়। ঘর-বাঁধার আশ্বাসও দিয়েছিল।

কিন্তু কি তার দাম!

ঝরাপাতা ঝরে গাছ থেকে—দিনগুলোও ঝরে যায়।

টিকে থাকে শুধু বেদনা আর দুঃখ।

ললিতা মাসীর দিকে চাইল। এ যেন ক্ষণিকে অন্য কোন মানুষে পরিণত হয়েছে। মাসীর মন শত বাধা আর নোংরামি ঠেলে উঠেছে একটি মুহূর্তের জন্যও, বেদনায় ভরে গেছে।

—ও-সব ভুলে যা ললিতা। শুধু দুঃখই পাবি। লাভ কি? ঘর থেকে একবার যে ছিটকে পথে পড়ে, ঘর আর তাকে ডাকে না।

ললিতার কান্না আসে।

মাসীর বুকে মুখ রেখে কাঁদছে অসহায় একটি নারী।

বুড়ির চোখেও জল আসে। আঁধার নামে। ব্যর্থতা আর শূন্যতা ভরা অন্ধকার। তারই অতলে হারিয়ে গেছে নাম-পরিচয়হীন দুটি নারী।

শীতের একটুকরো মেঘ জমেছে দূর আকাশে। জাগর তারাগুলোকেও ঢেকে দেয় নিবিড় অন্ধকারে। একটা শিয়ালের ডাক একবার উঠে দীর্ঘতানে মিলিয়ে গেল বাতাসে—করুণ আর্তনাদের সুরে।

কয়েক বৎসর পর ফিরে এসেছিল পুরন্দর। ইংরেজ সরকার

আগুনের প্রথম ফুলকিটাকেই চাপা দিয়েছিল। ও মেলা থেকে চলে যাবার পরই শুরু হয়েছিল পিকেটিং, হরতাল অনেক কিছু। সামান্য ব্যাপার থেকে জল এতদূর গড়াবে তা ভাবেনি ওরা। সেই হরতাল গড়িয়েছিল শহর অবধি। অনেকদিনই তার জের চলেছিল।

তার ফলেই বোধহয় পুরন্দরকে অন্য জেলায় চালান করেছিল। এবং মেয়াদের পরও নজরবন্দী করে রেখেছিল পদ্মার ধারে কোন্ এক ছোট্ট থানায়।

পুরন্দর আজ অনুভব করে সে বন্দী। তার যেখানে-সেখানে যাবার, ঘোরবার, এর-ওর সঙ্গে মেশবার অধিকারও নেই। নিজের জগৎটুকুতেই থাকতে হয় তাকে।

বন্দী মানুষ। তার ঘোরবার চৌহদ্দিও বাঁধা। পদ্মার বাঁধটার ওদিকে আমবাগানে সন্ধ্যার কালো ছায়া নামে—দেওয়াব আর বাবলা-বনে বাবলাফুলের গন্ধমন্দির বাতাসের আনাগোনা।

পড়াশোনা করবার চেষ্টা করেছে পুরন্দর। অখণ্ড অবসর, অনেকগুলো পালাই লিখেছে—তাই পড়ে মাঝে মাঝে।

একজনকে সে এখনও ভোলেনি। সেই ললিতা।

পুরন্দর কেমন যেন নিজের অতীত জীবন ভুলে গেছে। ভুলে গেছে মেলার কথা। শুনেছে ন্যাড়া দল রাখতে পারেনি, তুলে দিয়েছে। রামপদ আবার তাঁত নিয়ে পড়েছে। আজাহার শুরু করেছে সেই পটখেলানো আর ভিক্ষাবৃত্তি। পুতুলনাচের দল পুরন্দরের অভাবে চালানো যায়নি। উঠে গেছে সেই দল।

ললিতার খবর জানে না। ওর জন্য মাঝে মাঝে মনকেমন করে। জীবনের একটা উজ্জ্বল মুহূর্ত বিস্মৃতির অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। কবে মুক্তি পাবে জানে না।

একটার পর একটা দিন গোনে পুরন্দর। তার মুক্তির দিন।

* * *

—অধিকারী মাশায় গো! অধিকারী মাশায়! ডাকছে কানিকুড়ো।

অনেক দূর থেকে যেন ডাকটা কাছে আসছে, বাতাসে ভেসে আসছে। কেমন এই জগতে ফিরে আসে পুরন্দর ওর ডাকে। অন্য এক পরিবেশ। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল বুড়ো পুরন্দর।

কম্বলটা মুখের উপর থেকে সরিয়ে ছেলেটার দিকে চাইল। কানিকুড়ো এগিয়ে আসে। উঠে বসল পুবন্দর। জ্বরটা কমেছে।

বেলা পড়ে আসছে। মধ্য-আকাশ থেকে সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছে, বটগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মিঠে আলোটুকু এসে পড়েছে গায়ে। দু'-একটা পাখী ডাকছে উদাসকরা সুরে।

কোন বিচিত্র স্বপ্নভরা জগৎ থেকে ফিরে এসেছে পুবন্দর কঠিন রুক্ষ বাস্তব পৃথিবীতে। ওদের খাওয়াদাওয়ার পব চটকা ঘুমও হয়ে গেছে। গরুর গাড়িতে মালপত্র হাঁড়িকুড়ি তোলাও সারা। দল যাবার জন্য তৈরি। এখনও কয়েক ক্রোশ পথ যেতে হবে তাদের।

এইবার যাবার পালা, একবেলার ডেরা পথের ধারে সেরে ওরা এইবার যাবাব যোগাড় কবছে। পুবন্দরকে যেন দয়া কবে তুলেছে ওরা।

সানাইদার বলে ওঠে :

—অধিকাবী মাশায়, বল কুন্‌দিকে যাবো? ইদিকে ঘর আর উদিকে বৈরাগীতলার মেলা। যাই কুন্‌দিকে? পাওনাগণ্ডা না মিটলে সটান ঘরে চলে যাবো।

বেন্দা-ঢুলীরও তেমনি কথা। সে-ও অনেকদিন পয়সা পায়নি। বলে ওঠে :

—তাই বল সাফ সাফ। দেবা না, উজুবো ঘরমুখো?

ওবা বেঁকে বসেছে। একটা মীমাংসা করতে চায়।

এমন হতদারিদ্র্যের মধ্যে পুবন্দর কখনও পড়েনি। ওদের রোজ মেটাতে পারেনি। ওদের খাওয়াদাওয়াও ঠিকমত দিতে পারেনি। ওদের দোষ কি? কি ভাবছে পুরন্দর। তবু যদি বৈরাগীতলার মেলায় কিছু আমদানি হয় ওদের দিতে পারবে, সেই আশাতেই চলেছে।

বলে ওঠে সানাইদার—কই গো, কি বলছ ?

পুরন্দর বলরামের দিকে চাইল। সেদিনের আর কেউ নেই। একা বলরাম আজও টিকে আছে। ধনুকবাঁকা দেহ। পায়ের ফাটা দাগগুলো আরও বেড়েছে, অতীতের সেই যুবক বলরাম আজ বুড়ো। তার যাবার জায়গা কোথাও নেই তাই চুপ করেই থাকে।

সানাইদারকে পুরন্দর অনুনয় করে—এই মেলাটা দেখতে দে, এ্যাদ্দিন আছিস। তারপর যা ভাল বুঝিস করবি।

ঢোলওয়ালা বেন্দাও কি ভাবে। এখান থেকে এখন গেলে যে শুধু-হাতেই যেতে হবে তা ভালোই জানে। কি ভেবে নিমরাজী হয়।

—বেশ। তাই চল। চল রে বিষ্টুপদ। শ্যাষই দেখি ইবার।

বিষ্টু সানাইয়ের বাক্স তুলতে তুলতে বলে :

—চল। তবে হ্যাঁ অধিকারী, বলে-কয়েই যেছি—এ্যাই শ্যাষ! তারপর যে আবার পদা-পদা করবা, তা হবে না। হ্যাঁ!

পুরন্দর অধিকারী কথা বলে না।

ওরা সড়কে নামল। মাইল পাঁচেক পথ, জোরে গেলে সন্ধ্যার আগেই মেলায় পৌঁছবে। গাড়োয়ান বলে ওঠে পুরন্দরকে :

—আপনি নেবো মানুষ। গাড়িতেই ওঠেন কেনে।

কি ভেবে পুরন্দর খোলা মালের গাড়িতে উঠে চট-তেরপলের বাণ্ডিলের ফাঁকে একটু জায়গা করে নিল শোবার।

চলেছে আবার ধুলো উড়িয়ে গরুর গাড়িখানা। চাকায় তেল নেই। তাই স্তব্ধ পথে একটা আর্তনাদ তুলে খানাখন্দে আছড়ে পড়ে আবার গড়িয়ে উঠে চলেছে গাড়িখানা।

বেশ অনুভব করে পুরন্দর সারা শরীরে একটা বেদনা।

সর্দি-জ্বরই হবে। বুকের পাশে বেদনা করে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকটান ধরে।

আজ জীবনের দীর্ঘ পথে বিরাট একটা বোঝা টেনে সে ক্লান্ত পরাজিত হয়েছে। তবু চলবার বৃথা চেষ্টায় নিজের মনেই দুঃখ হয়।

দল তার ভেঙে গেছল আগেই।

জেল—তারপর নজরবন্দী অবস্থা থেকে ছাড়া পেতে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। গ্রামে ফিরল যখন, দেখে এতদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা বাড়িটাও ফাঁকা,—পাঁচিল ভেঙে রাস্তা আর বাঁশবনের সঙ্গে মিশে গেছে।

বাবা অনেক আগেই মারা গেছে। ছিল মা, সে-ও গেছে। বোধহয় অনাহারে আর দুঃখে মা-ও মারা গেছে।

এত সাধের দল কোথায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শূন্য চারিপাশ। বাঁশবনের সবুজও মিলিয়ে গেছে। চারিদিকের সেই পরিবেশটা নেই।

নতুন কোন জায়গায় যেন এসে দাঁড়িয়েছে পুরন্দর, দীর্ঘ দিন পর!

এই মাটি, ওই ঘর, ওই সবুজের মাঠে তার ঠাঁইটুকু—কোথায় হারিয়ে গেছে।

চুপ করে বসে থাকে পুরন্দর শূন্য ঘরের দাওয়ায়।

ন্যাড়া আসে দেখা করতে।

উঠোনে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল। গোদালে লতা আর আসশেওড়া গাছগুলো সব গ্রাস করেছে। চালে উঠেছে কেঁতুরি তিতপল্লার সবুজ গাছ। বাখারি খড়গুলো পচে পচে খসে পড়েছে। আর দু'-এক বছরেই ওর সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যেত।

—এখানে কোথায় থাকবে পুরোদা? এ যে ভিটেপুরী।

ন্যাড়ার কথায় ওর দিকে চাইল পুরন্দর।

নিজের দিকে চেয়ে দেখেনি। ন্যাড়ার দিকে চেয়ে বেশ বুঝতে পারে তার বয়সও অনেক হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলোয় এধার ওধারে পাক ধরেছে। শরীর আর মনে আগেকার সেই উৎসাহ আর নেই। সেই পুতুলনাচ আর পালাবাঁধার মনটা কেমন মরচে ধরে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সব ফুরিয়ে গেছে যেন পুরন্দরের।

ক্রমশঃ তবু ফিরে আসে সেই চিন্তাই। পুরন্দর দল গড়ার কথা ভাবছে।

ন্যাড়ার কোলে একটা ছোট ছেলেকে দেখে পুরন্দর বলে ওঠে :

—ও কে রে ?

—আমার ছোট ব্যাটা।

ন্যাড়া এখন ঘোরতর সংসারী। ঘর বেঁধেছে। একবার ওর দিকে চাইল।

—রামপদা ? সে কোথায় ?

—সে কুন্ চিনকুঠিতে কাজ করছে, আসানসোলের ওদিকে। অনেকদিন বাড়িঘর আসেনি।

একে একে খোঁজ নিচ্ছে বন্ধুদের পুরন্দর।

—আজাহার ?

ন্যাড়া মাথা নাড়ে : গত সনে কলেরায় সে-ও মারা গেছে।

চুপ করে থাকে পুরন্দর। একটা আচমকা ঘা খেয়েছে যেন।

সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একে একে সবাই মরে গেল, সরে গেল।

হঠাৎ কার চিৎকারে ফিরে চাইল পুরন্দর। একটা মেয়ে, টাকপড়া কপালে মস্ত সিঁদুরের কাঁচা সড়ক—তেমনি মোটা। হাতে একগাদা বাঁখারি আর কাঠকুটো। ন্যাড়ার দিকে এগিয়ে আসে। ন্যাড়া ওকে দেখে একটু ঘাবড়ে যায়।

সেই সঙ্গে মুখে কঠিন ভাষা। মেয়েটি গলা সপ্তমে তুলেছে।

ন্যাড়া থামবার চেষ্টা করে : মূলগায়েন, আমাদের পুরোদা!

কে কার কথা শোনে। ন্যাড়াকে যে ওই মেয়েটা কত সুখে রেখেছে তা বেশ বুঝতে পারে পুরন্দর।

ন্যাড়ার বৌ গর্জন করে চলেছে :

— তোর পুরোদার কাঁথায় আগুন! বলি, ঘরে যে চাল বাড়ন্ত তা কি আমি দেখবো ? ইদিকে নেমতন্ন তো করা হয়েছে! জোটেও সব ঘাটের ম া! পুরোদা! মূলগায়েন—আরশুলা আবার পাখী। তা,

এই বাঁশবনেই গা এক পালা। শুনি কেমন গায়েন। মূলগায়েন! ওরে আমার রে! এমনি গায়েন লয়—মুলো গায়েন!

পুরন্দর ওর দিকে চেয়ে থাকে। এমন সমালোচনা কোথাও শোনেনি।

ন্যাড়া কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে একটা বাঁখারিভাঙা নিয়েই তাড়া করে রেগেমেগে।

—যাবি, না সাঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব মাগীর! এ্যাঁ!

ছেলেটা প্রাণপণে চিৎকার করছে ব্যাপার দেখে। পুরন্দরই বাধা দেয়। ব্যাপারটা অনুমান করেছে সে-ও। বলে ওঠে:

—এইখানেই সাফসুতরো করে থাকবো ন্যাড়া যে ক'দিন থাকি।

—এই বনে থাকবা? ন্যাড়া বলবার চেষ্টা করে।

—হোক, তবু বাপের ভিটে।

ন্যাড়া আমতা আমতা করে—ওর জিবটাই অমনি পুরোদা। তবে লোক খারাপ নয়। তবে কিনা গানের দলে ছিলাম তো, তাই গান আদবেই পছন্দ করে না।

পুরন্দর জবাব দেয়নি। কি ভাবছে। বলে ওঠে—দলের কিছু জিনিসপত্র আর আছে রে?

পুরন্দরের কথায় ন্যাড়া একটু যেন বিপদে পড়েছে। সে হ্যাজাক আলোটা, কলের গানটা বেচে দিয়েছে অভাবের চাপে। কিছু ছেঁড়া চট-তেরপল পড়ে আছে। আর আছে কয়েক বাক্স পুতুলের সাজ। তাও আর বহুকাল উলটে-পালটে দেখেনি, ও-পাট তুলে দিয়েছে।

ন্যাড়া বলে—আছে কিছু। তবে দেখতে হবে খুলে-পেতে। অনেকদিন দেখিনি তো।

পুরন্দর একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে:

—দিয়ে যাস ওগুলো।

পুরন্দর আবার স্বপ্ন দেখছে। এ ছাড়া তার পথই বা কি! আর কোন বিদ্যাই তার নেই। বাঁচা মরা ওই পথেই।

পুরন্দর বলে ওঠে—হ্যাঁরে ন্যাড়া, আর যাবি দল করলে ?

ন্যাড়া কি ভাবছে।

সেদিন ঝাড়া-হাত-পা ছিল। সংসার, ওই দমনকর্তা—কোনটাই ছিল না। ছিল না এই এণ্ডিগেণ্ডির দল। এখন ন্যাড়া পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে। নাপিতের ছেলে বাধ্য হয়ে আবার জাতব্যবসা ধরেছে। যজমান-যাজকও আছে ঘরকতক। বাজারে একটা ঘর নিয়ে সেলুন করেছে। বাপ-বেটার রোজগারে কোনমতে দিন চালায়।

এসব ছেড়ে যাবার উপায় আর নেই। তাই মাথা নাড়ে ন্যাড়া ঃ

আর যাবো কি করে পুরোদা—যাবার পথে কাঁটা দিয়ে দিইছি।

ন্যাড়াও জবাব দিল। ঘর ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে আর বের হবে না সে। বেশ জেনেছে পুরন্দর, ওরা কেউ আর আসবে না।

অতীতের দিনগুলোর সঙ্গে পুরনো বন্ধুরাও সব হারিয়ে গেল।

আবার পথে নেমেছে পুরন্দর একাই।

ওরা কেউ আসেনি।

পুরন্দর তবু বসে নেই। আবার চেষ্টা করে সামান্য যা পুঁজি ছিল, তাই ভেঙে জোড়াতালি দিয়ে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে।

আবার দল গড়েছে পুরন্দর।

জীর্ণ রং-চটা পুতুল—ময়লা বিবর্ণ সাজপোশাক আর তার চেয়েও জীর্ণ ফুটো চটের ঘের। মাথার উপর তেরপল চাপায় পুতুলনাচের ঠাঁইটুকু, বাকী সব ফাঁকাই থাকে।

তাই যোগাড় করতে তোড়জোড় করতে বাকী জমিজেরাত যেটুকু ছিল সবই হাতছাড়া করতে হয়েছে।

অনেক ভেবেছে পুরন্দর।

দেশের হাবভাব বদলাচ্ছে। নতুন দিন আসছে।

নুয়ে-পড়া ঘরখানায় বাঁখারি আর ফুটো চালের ফাঁক দিয়ে রাতের

তারা দেখা যায়, তারায় ভরা আকাশ। তারই মাঝে একা বসে থাকে পুরন্দর। কি ভাবছে।

ধোঁয়াওঠা চৌখুপি লণ্ঠনটার লালচে আলোয় পুরন্দর একা বসে আছে।

চারিদিকে ছড়ানো বাক্স-খোলা সেই পুতুলগুলো। বহুদিন বাক্স-বন্দী থাকার ফলে একটা পুরনো দিনের গন্ধও রয়ে গেছে ওতে মিশে। কত স্মৃতি আর দিনের ইতিহাস মেশানো সেই গন্ধ। ভালো লাগে, মনটা উধাও হয়ে যায় সেই হারানো দিনের খোঁজে।

রাতের বাতাস বইছে—হু হু শব্দ তোলে বাঁশবনে। সেই আকাশে আগেকার তারাগুলোও রয়েছে, তেমনি করুণ ভালো-লাগা চাহনিতে আজও চায় তারা। দূরের পথে চিরকাল অধরাই রয়ে গেল তারা। ওইসঙ্গে একজনের কথা আজও মনে পড়ে।

ললিতাকে ভোলেনি সে।

ন্যাড়াকে তার কোন খবরও জিজ্ঞাসা করতে পারেনি।

নামোপাড়ার ওদিকেও গিয়েছিল নিজেই, ললিতা নেই। ফেরেনি তারা আর। পুরন্দর ধ্বসেপড়া বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা স্ত্রীলোক শুধু সেদিনের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। ধুঁকছে। চোখের কোলে পিচুটি, দেখতেও পায় না ভালো করে। লাঠি ঠুকে মৃত নামোপাড়ার শোকে ঘেংড়ে ঘেংড়ে কাঁদে সে।

ওকে একটু দেখে তবে চিনতে পারে। এগিয়ে এসে বলে :

—পুরন্দর, না ?

—হ্যাঁ। পুরন্দর জবাব দেয়।

কর্কশ গলায় মেয়েছেলেটা বলে চলেছে :

—এসেছিস তালে ! শোনলাম ঘানি টানাচ্ছিল তোকে।

হাসে পুরন্দর। ছেঁড়া ত্যানাখানা মেয়েমানুষটা কোনরকমে জড়িয়ে পরেছে। মাথার চুলগুলো শণনুড়ি হয়ে গেছে। কাসছে বুড়ি। ধুঁকছে।

কোনরকমে সামলে নিয়ে বলে ঃ

তা কি মনে করে এ-পাড়ায়? অস্ আছে তালে এখনও? ত্যাল মরেনি? তাই ঘুর ঘুর করছিস?

পুরন্দর জবাব দিল না।

বুড়ি দাঁত-পড়া মাড়ি বের করে হাসছে খিকখিক্ শব্দ করে।

পুরন্দরের কেমন মায়া হয় ওই বুড়িকে দেখে। জীবনের নির্মম পরাজয়ের চিহ্ন ওর সর্বাঙ্গে আঁকা।

বুড়ি বলে চলেছে ঃ

—গুড় মরে 'ভানজুরো' হয়। তোরও তাই নাকি হ্যাঁরে? বয়স তো ঢেক হল।

পুরন্দর কথার জবাব দিল না। দেখছে সে যা দেখবার। ললিতাদের বাড়িটা আজ ধ্বসে পড়েছে। এদিক-ওদিকে বাড়ি উঠছে। নতুন বাড়ি। নামোপাড়ায় এসেছে অনেক নতুন মানুষ—নতুন যৌবন।

হারানো যৌবন কবে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে—সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে তাদের দিনগুলোও, নানা রঙের কত দিন।

চলে আসছে, বুড়ি হাত পাতে—ছুটো পয়সা দিবি?

পুরন্দর শেষ সম্বল কয়েকটা পয়সা থেকে একটা আনি ওর হাতে দেয়। চোখের কাছে পরখ করে দেখে বলে ওঠে—চলবে তো বে? অচল লয় তো?

পুরন্দর জবাব দিল না। পথটা বেয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে ততক্ষণে। মনে একটা শূন্যতা। পুরন্দর যেন এখানের মানুষ নয়।

সারা গ্রাম বদলে গেছে। বদলে গেছে আগেকার দিনগুলো, প্রাচুর্য আর শান্তির দিনগুলো পল্লীপ্রান্তর থেকে বিদায় নিয়েছে রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে।

সময়ের গতিও বেড়ে গেছে। শহর হয়ে উঠেছে তাদের সনাতন পুরনো গ্রাম। আজকের নতুন মানুষও পুরন্দর অধিকারীর নাম ভুলেছে। কবে হাজারো শহীদের ভিড়ে সে কোন্ মেলায় পুতুলনাচ

দেখিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল, আজ তার দাম কেউ বিচার করতে বসে নেই।

সে সময় আর কারো নেই।

তবু ভোলেনি পুরন্দর সেই দিনগুলো।

পুরনো পুতুলের দল রাতের অন্ধকারে নির্জন ঘরে যেন সজীব হয়ে উঠেছে। রাম-লক্ষ্মণ-অন্ধমুনি, ভীম-অর্জুন-কর্ণ, সিরাজ-মীরজাফর-ওয়াট্‌স্—সকলেই।

তার কাছে ওরা মহাকালের গতিছন্দে এক একটি যুগরূপে চিহ্নিত, তার জীবনের ক্ষুদ্র গতিপথের ওরা পথচিহ্ন প্রতীক।

ললিতা—আরও কারা সব ভিড় করে আসে। তার জীবনের মধুমাসের হারানো সৌরভ নিয়ে।

আবার পথেই নামবে সে।

বড়ঘরে ওই স্মৃতি প্রস্তরস্তূপের নীচে ফসিল হয়ে কবরস্থ হবার বাসনা তার নেই। তাই ঠিক করে পুরন্দর।

রাতের আঁধারে মনে মনে সব হারানো শক্তি-উৎসাহ সে একত্রিভূত করে তুলেছে নতুন করে সংগ্রাম করবার জন্য।

পুরন্দরকে ওরা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু সে দেখাবে পুরন্দরকে ভোলা যায় না। সে হারায়নি। সে বেঁচে আছে। দেখাবে, সারা অঞ্চলে পুরন্দর অধিকারী আজও বেঁচে আছে সেই শক্তি নিয়ে, পুতুলনাচই শুরু করবে সে নতুন করে।

ভেবেচিন্তে দু'একদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলে। সোনা-ফসলের ক্ষেতে কয়েক বিঘে জমি ছিল তাই বেচবে দত্তমশাইকে। কে দেখবে তার জমিজারাত ?

শুনে ন্যাড়াও এসেছে। আমতা আমতা করে—ওসব করো না পুরোদা ! জমি লক্ষ্মী, ওসব বিচো না। তবু ঘর-জমিটুন থাক।

—তবে ? পুরন্দর প্রশ্ন করে ওকে।

ন্যাড়া বলে :

—জমি থাক, তবু খাবার ধানটা পাবা। হাতের কাজ জানো, আজকাল ছুতোরমিস্ত্রীর দরও অনেক। চার টাকা রোজ। কাজকর্ম করো, ভালোই চলে যাবে। ওসব পুতুলনাচ আর চলবে না। ছেড়ে দাও।

পুরন্দর অবাক হয়ে ন্যাড়ার দিকে চেয়ে থাকে। মরে গেছে যেন ন্যাড়া। কোলে-কাঁকে ছেলে টানছে, আর দাড়ি-চুল কাটছে।

পুরন্দর জীবনের কোন দায়ই মানেনি। শিল্পী সে—ওই জোয়াল টেনে খেটেখুটে শুধু খেতে চায় না—বাঁচতে চায় না। বলে ওঠে।

—ওসব আমি পারবো না ন্যাড়া।

ন্যাড়া এই জগতের সংস্পর্শে রয়েছে। মেলাখেলায় ঘোরে এখনও। মেলা দেখতে যায়। দেখেছে, জানে, ও-সবের দিন ফুরিয়েছে। কেউ আর দেখে না। তাই বলে :

—ভুল করো না পুরোদা। পুতুলনাচের ভরসা আর করো না।

কথাটা শুনে হাসে পুরন্দর। ভুল !···সারা জীবনে হয়তো ওইটাই করে এসেছে। যেগুলো হওয়া উচিত ছিল না, সেইগুলোই হয়েছে একটার পর একটা। তাই ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া, একা সে।

ন্যাড়ার কথায় হাসে পুরন্দর।

জবাব দেয়—সারা জীবনে ওইটাই ঘটেছে ন্যাড়া, আজ শেষ বয়সে আর হঠাৎ কেন ওটা ঘটতে না দিই ? ভুলই হোক আর ঠিকই হোক— এ ছাড়া আর পথ আমার নাই। এই আমার অদৃষ্টে আছে। বিধাতাপুরুষের মত পুতুলনাচানোই আমার কাজ।

ক'দিনের মধ্যেই পুরন্দর তৈরি হয়ে নেয়।

পুরনো পুতুলগুলো রং করেছে। কিছু সাজপোশাকও কেনে। সেই সঙ্গে আনায় চট-তেরপল।

জমি-বিক্রীর টাকা সামান্য কিছু হাতে রেখে আবার মালপত্র তৈরি করে। আজ নিঃস্ব পথের মানুষ সে। এই তার একমাত্র ভরসা।

তাই নতুন উৎসাহে আবার কাজে নেমেছে। দলের লোকজনও যোগাড় করেছে। শরীরে সয় না—মনে হয় ক'টা বছরেই বুড়ো হয়ে গেছে সে।

কিন্তু তবু দমে না পুরন্দর। এই নেশাতেই মেতে ওঠে।

তৈরি হয়ে দল নামাল আবার।

ঘর যেটুকু ছিল তাও চিরকালের মত ছেড়ে পথেই নামল পুরন্দর এবার পাকাপাকিভাবে। গ্রাম ছেড়ে আসবার দিন ময়ূরাক্ষীর ধার পর্যন্ত পুরন্দরকে এগিয়ে দিতে আসে ন্যাড়া পিছু পিছু।

পথপাগল বিচিত্র একটি মানুষ ওই ন্যাড়া। আজও মন টানে বাইরের দিকে। কিন্তু পথ তার হারিয়ে গেছে। ছটফট করে বন্দী মন। যাবার পথ তার রুদ্ধ।

ধরা গলায় ন্যাড়া ডাকছে ওকে :

—পুরোদা !

পুরন্দর শেষবারের মত গ্রামের দীর্ঘ ছায়াছন্ন বাগান, গাছগাছালি, আর বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে ছিল। আর ফিরবে না কোনদিন। কি মায়াই বা তার রইল এখানে ? সবকিছু পরিচয় মুছে দিয়ে পথে নামল পুরন্দর।

কিন্তু আজ যাবার সময় মনে হয় তার আগেকার জীবন—শিল্পী-সত্ত্বার প্রথম জন্মলগ্ন ঘটেছিল এই মাটিতেই। মা আর মাটি তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। সেই রঙীন অতীতের জীবন—একটি শিশু কিশোরের অপমৃত্যু ঘটল আজ। পুরন্দর আজ এতবড় বিশ্বে একা।

ন্যাড়ার ডাকে ওর দিকে চাইল। ন্যাড়ার চোখে জলের রেখা। অতীতের বহুদিনের বন্ধু। একসঙ্গে বড় হয়েছে।

বলে ওঠে—সত্যি চলে গেলে পুরোদা ?

এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না ন্যাড়া, পুরন্দর এ মাটি ছেড়ে চলে গেল।

মাথা নাড়ে পুরন্দর।

নদীর ওপারে চলে গেছে পথটা। তালগাছগুলোর ফাঁকে সূর্য নামে—পথের ধুলো লালচে হয়ে ওঠে শেষ সূর্যের আলোয়, ভ্রমরগুলো উড়ছে আকন্দফুলের সন্ধানে। পুরন্দর শেষবারের মত চাইল। ন্যাড়া তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে।

পুরন্দরের জীর্ণ চোখের কোণে আসে জলের আভাস। মনে হয় বিরাট পৃথিবীতে অন্তহীন ওই মাঠের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে একা।

তার পরের ইতিহাস আরও করুণ, আরও বেদনাময়। ন্যাড়া ঠিকই বলেছিল। দিন বদলেছে, রূপ বদলেছে সমাজের, মানুষের রুচি বদলেছে—আমূল বদল যাকে বলে।

সেদিনের হারানো সম্মান, সেই নাম-ডাকের আজ কোন দাম নেই। আজকের মানুষ তাকে চেনে না। ক'বছরেই তারা সব ভুলে গেছে। সেই কথাটা ক্রমশঃ বুঝেছে পুরন্দর।

কয়েকটা ছোট মেলায় ঘুরে তা বেশ বুঝতে পেরেছে পুরন্দর। সেই চাষী গৃহস্থ সপরিবারে আসে—তবে আর শীতরাত্রের হিম সয়ে সারারাত ধরে মেলার আলো-কোলাহল দেখে শুনে বেড়ায় না।

দোকানগুলোর রূপ বদলেছে। রকমারি চকচকে জিনিস আসে, আসে ভালো সার্কাসের দল। ম্যাজিক। আর জমে জুয়ার আসর —কার্নিভাল। বালা খেলা, বন্দুক ছুঁড়ে টিপ করলেই সিগারেটের বাক্স মেলে। আরও কত নতুন জিনিস আসে। সেইদিকেই ভিড় করে সকলে।

যাত্রার আসর বসে, তবে সারারাত্রি আর সে গান চলে না। বিশাল তাঁবুতে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে। ঝলমলে আলো লোকজনের ভিড় সেইখানেই। গানের সুর ওঠে।

কোলাহল আলো আর নতুন জীবনের একপাশে ওর ছেঁড়া তাঁবু আর সনাতন ঢোল-সানাইয়ের সুর ডুবে যায়। হারিয়ে যায়—তা দেখতে শুনতে বিশেষ কেউ আসে না। সবাই ওই ঝলমলে আলোর মাঝেই যায়। আঁধার তাবুতে কেউ আসে না পুতুলনাচ দেখতে।

শিউরে ওঠে পুরন্দর।

দীর্ঘ কয়েক বৎসর আবার এই পথে ফেরবার চেষ্টা করে মস্ত একটা ভুল করেছে। আজকের নতুন মানুষ পুরন্দর অধিকারীর পুতুলনাচের সেই কাহিনী ভুলে গেছে। যারা এখনও জানে, তারাও এ যুগে এই দিনে বাতিলের দলে চলে গেছে।

তবু পুরন্দর শেষ চেষ্টা করবে একবার। তাই আজ সব হারিয়েও বৈরাগীতলার মেলায় চলেছে।

* *

সন্ধ্যা নামছে। শীতের সন্ধ্যা। আকাশে ওর সূচনা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ছিটানো আলো মুছে আসে ধীরে ধীরে। নীল—ক্রমশঃ লাল—তারপর ফিকে কালো হয় সেই আলো। আকাশ-কোলে ক্লান্ত পাখায় ভর করে বাসায় ফেরে পাখীর দল—তাদের কলরব জাগে বাতাসে।

ফুটিসাঁকোর কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা।

গরুর গাড়িখানার তেলশণহীন চাকাটা আর্তনাদ করে চলেছে। লোকজন চেয়ে থাকে ওদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

দীর্ঘদিন, অনেক বৎসর পর আবার আসছে পুরন্দর এই পথে। একদিন সন্ধ্যার আগেই ফুটিসাঁকোর মাঠ ফাঁকা হয়ে যেত, বাগানের কাছে ছায়াঢাকা জনহীন রাস্তায় চলতে গা ছমছম করত—কখন পথচলতি পথিকের পায়ে এসে লাগবে ঠ্যাঙাড়ের হাতের ফাবড়া—হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তারপরই ওর ওপর পড়বে লাঠির পর লাঠি, সব শেষ করে লুটেপুটে আবার চলে যাবে তারা। এই ভয়ে লোক আসত না এদিকে।

সেদিনের সেই জনমানবহীন ঠাঁইটাকে দেখে আজ চিনতে পারে না পুরন্দর। কেমন ভোল বদলে গেছে। ছোট লাইনের ধারে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো নয়, বেশ ভালো বসতি। স্টেশনের চালার বদলে উঠেছে পাকা ঘর, আলো জ্বলছে।

ওপাশের বটতলায় সারা মুলুক জুড়ে কল বসেছে—ধানকল। বিজলী-বাতি জ্বলছে। মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে বিজলীব তার নিয়ে লাইনটা। সারা মাঠে আজ শহব বসেছে।

উঠে বসল পুরন্দর। ওই দিকে চেয়ে দেখছে।

গরুর গাড়ি থেকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পুরন্দর।

জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সব—এর চারিপাশে ভিতবে বাইরে এসেছে আমূল পরিবর্তন। ধুলোঢাকা রাস্তাটাও হারিয়ে গেছে, গড়ে উঠেছে সিমেণ্ট-কংক্রিটের চওড়া রাস্তা।

ভোঁ—!···বিকট একটা শব্দ। দুটো তীব্র হেডলাইট জ্বেলে বেগে এগিয়ে আসছে একটা বিবাট ট্রাক—একটার পর একটা, দল বেঁধে। চলেছে কোন সার্কসের দল। শুরু হয়েছে ভিড়, লোকজন-গাড়ি-মোটরগাড়ি-ট্রাকের ভিড় এখান থেকেই শুরু হয় মেলা অবধি। ওবা এই ভিড়ে হারিয়ে যায়।

পদা সানাইদাব বেন্দা বলরাম সবাই কি একটা ভয়ে যেন চুপ করে গেছে। কানিকুড়োর দু'চোখে অবাক বিস্ময়।

—উরে বান্‌তানাস্‌ রে! পব্বত গেল নাকি গো অধিকারী মাশায়! আমাদের গরুটো তো একেবারে ফ্যাচকা, দিইছিল উল্টেমুল্টে। কুন্‌ রাজ্যে এলাম গো!

কানিকুড়োর কথায় জবাব দেয় না পুবন্দর।

নিজেই সে অবাক হয়ে গেছে। ফ্যাচকা গরুব মত চোখে ধাঁধা লেগেছে তার এ-সব দেখে-শুনে।

ধানকলের ভোঁ বাজছে—কেমন বিকট শব্দটা আকাশ-বাতাস ভরে তুলেছে। মাঠ পার হলেই মেলার শুরু।

এখান থেকেই আলোব আভা দেখা যায়, কালো আঁধার ভেদ করে আলোর আভা উঠছে। মেলা জমে উঠেছে এরই মধ্যে।

বাতাসে শোনা যায় মাইকে গানের শব্দ! কোন মেয়েছেলের মিষ্টি গলা—ইনিয়ে-বিনিয়ে চাঁদ আর ফুল, সেই সঙ্গে জমাট ভালোবাসার

কথা আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে সারাদেশের লোকের কানে। নির্লজ্জ ভালোবাসার কথা।

কানিকুড়ো বলে ওঠে—গান শুনছ অধিকারী মাশায় ?

পুরন্দর কথার জবাব দিল না। জীর্ণ দু'চোখ মেলে অতীতের সেই নিঃস্বতা আর আজকের এই জায়গার রূপ তুলনা করে চলেছে।

কানিকুড়ো বলে চলেছে ওকে শুনিয়ে তার মনের কথাগুলো। ওর একার কথা নয়—এ যেন ওদের দলের বাকী সকলেরই কথা।

—শোনলাম টকিবাজি এয়েছে, শোধ মেলা কিনা। দেখাবা একদিন টকিবাজি ? ছায়াতে কথা বলে—গান করে, নাচ করে। সম্মাই বলে পুতুলনাচের চেয়ে ঢের ভালো। লয় গো ?

পুরন্দর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

মাথাটা ধরে রয়েছে—গায়ে-হাতে-পায়ে বেদনা। বুকটা টনটন করছে। সন্ধ্যার সঙ্গে ফাঁকার শীতও কনকন করে লাগে। কানিকুড়োর ওই বকবকানি ভালো লাগে না।

—থাম দিকি বাপু! মেলা বকিস্ না।

থেমে গেল ছেলেটা। অধিকারীর দিকে চেয়ে থাকে।

চুপ করে আলো-আঁধারির মধ্যে গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে।

কলরব কোলাহল—সার্কসের ব্যাণ্ড-ফ্লুটের শব্দ, বায়স্কোপের ওই মাইকের গর্জন—সব মিলে একটা তাণ্ডব চলেছে ওখানে।

বৈরাগীতলার এ রূপ আগে দেখেনি পুরন্দর।

মাঠের নির্জনতার মাঝে মেলাটা একটা স্বপ্নময় সুরে আর আলোয় জেগে উঠত। এমনি উন্মাদনা আর গর্জন শোনা যেত না সেখানে।

মেলায় ঢোকবার মুখেই একটা কাণ্ড বাধে।

একটা টর্চের আলো পড়ে ওদের মুখে, কয়েক জন এসে দাঁড়ায়।

বেগতিক দেখে বেন্দা আর পদা সানাইদার—সেই সঙ্গে বলরামও আঁধারে ওপাশ দিয়ে মাঠে নেমে দোকান-পসারের ফাঁক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ওপাশের রাস্তায় ওঠে, মেলার মধ্যে ঢুকে ভিড়ে মিশে যায়।

কানিকুড়োকেই ধরেছে তারা।' বলে ওঠে :

—কলেরার ইন্‌জেকশন নিতে হবে।

—ও অধিকারী মাশায় গো, সূঁচ ফুঁড়ে দিলে গো!

ছোঁড়া প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। মেলায় ঢুকতে গেলে ওরা যাকে সামনে পাচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ফুঁড়ছে। পুরন্দরের জ্বর বলেই বোধহয় ছেড়ে দিল। কানিকুড়ো পালাবার সময় পায়নি।

কাঁদছে তখনও কানিকুড়ো। এমন খপ্পরে পড়বে তা ভাবেনি।

পুরন্দর একটু অবাক হয়। বড় মেলায় আজকাল এও নাকি রেওয়াজ। হবেও বা। দিন বদলেছে, এ-সবও হয়েছে তাই।

মেলার ভিতরে ঢুকতেই আঁধার গাছতলা থেকে এগিয়ে আসে বেন্দা, পঁদা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে বেন্দা :

—ফুঁড়েছে নাকি গো? এ্যাঁ! খপাৎ করে ধরেছিল আর কি!

পুরন্দর মাথা নাড়ে।

দূর থেকেই এ মেলার হালচাল দেখে ঘাবড়ে গেছে পুরন্দর। একদিন অতীতে এই মেলাতেই সে পেয়েছিল তার জীবনের কৃতিত্বের স্বীকৃতি। আজ এসেছিল অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু মনে হয় এ রঙ্গিনীও তাকে ভুলে গেছে।

ইন্‌জেকশনের ঠেলায় কানিকুড়ো তখনও কাঁদছে। হাসে বেন্দা।

—মর এইবার! পালালি না কেনে রে ছোঁড়া?

কানিকুড়ো বলে ওঠে :

—ধরে ফেলালে যি কপাৎ করে। লইলে এইসা দৌড়াতাম, ধরে কুন্ সম্বুন্ধী।

পুরন্দর অবাক হয়ে দেখছে নতুন বৈরাগীতলাকে। বহু বৎসর আগে এইখানেই তার খ্যাতির জীবন শুরু হয়েছিল সে কবে কোন্ এক বিস্মৃত রাত্রির অন্ধকারে।

অবিনাশ অধিকারী হঠেছিল—এগিয়ে এসেছিল সেদিনের নতুন

পুতুলনাচের অধিকারী—পুরন্দর। এই বৈরাগীতলায় সেদিন হাজার হাজার লোক তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ওই পুকুরের ধারে চাতরের মাঠে।

আজ মেলা-কমিটিও বদলে গেছে।

বিনোদ ডাক্তার, ভূপতি কুণ্ডু দু'জনেই মারা গেছেন। তাঁদের কারবার নামডাকও আজ বিলুপ্তপ্রায়। এখন সেক্রেটারি ওই আড়তদার ফুলচাঁদবাবু, আর প্রেসিডেন্ট অন্য কোন এক পদস্থ কর্মচারী, ফুলপ্যান্ট আর শার্ট গায়ে জিপে করে ঘুরে বেড়ান। তদারক করেন সব কিছু।

পুতুলনাচের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হল বাগানের পিছনে ছোট একটা বাজির তাঁবুর পাশে। এদিকে আলোও তেমন নেই, লোকজনও আসে না বড় একটা। বাজিওলা কয়েকটা ছাগল-বাঁদর নিয়ে খেলা দেখায়, আর খদ্দের ডাকবার জন্য ঘণ্টা বাজায়—মাঝে মাঝে চিৎকার করে খালি গলায়। কেমন মায়া হয় ওই তাঁবু আর লোকটাকে দেখলে।

মনটা দমে যায় পুরন্দরের। তার জন্য বরাদ্দ ছিল কয়েক বছর পুকুরধারে সদরে ওই চাতরের পাশের মাঠ। জামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

পুরন্দর বলে ওঠে—আজ্ঞে, চাতরের মাঠে ঠাঁই হবে না?

অবাক হন সেক্রেটারিবাবু। ওর জরাজীর্ণ দেহ আর ছেঁড়া জামাকাপড়, তার ওপর ময়লা চাদর দেখে বলেন—ওখানে সিনেমা বসছে কাল থেকে। দৈনিক একশো টাকা খাজনা দেবে। পারবে দিতে?

চমকে ওঠে পুরন্দর। উলটে আজ ওরাই খাজনা দিচ্ছে মেলা-কর্তৃপক্ষকে; তার কালে ভূপতিবাবু তাকেই টাকা দিয়েছেন পুতুলনাচের দলের ফুরন বাবদ।

সরে এল মুখ নীচু করে। বেশ বোঝে আজ ওরা তাকে কোন সম্মানই দেবে না।

আজ এ মেলার কেউ তাকে চেনে না।

তাই একেকোণে নির্বাসন দিতে চায় তাকে।

পুতুলনাচের দল—কিই বা তার সম্মান আর কৃতিত্ব আর পয়সায় জোর যে তাকে মেলার সদরে ঠাঁই দিতে হবে? সেদিন যা ছিল আজ তা নেই। বদলে গেছে সব।

চুপ করে সরে এল পুরন্দর।

পুরন্দর অধিকারীকে বৈরাগীতলার মেলা-কমিটি ভুলে গেছে। ভুলে গেছে এখানকার মানুষও তার নাম।

তবু এসেছে পুরন্দর—কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে তার ভাগ্যবিধাতা তাই দেখবে। একদিন বৈরাগীতলার মেলায় জীবন শুরু করেছিল—শেষ জীবনেও একবার একে শেষ দেখা দেখে যাবে, সব কাঠিন্যকে চিনে যাবে।

বেন্দা আর গাড়োয়ান গজগজ করে বকছে আপন মনেই।

মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে ওরা ওই আলো-আঁধারি ঠাঁইটুকুতে। বাঁশ কাঠ চট ছেঁড়া তেরপল আর কয়েকটা কাঠের বাক্স। এই তাদের মালপত্র। রাতের জন্য একটা আস্তানা কোনমতে খাড়া করে তুলেছে। চটের ছাউনি দেওয়া একটা কুঁড়ে তুলেছে। এককোণে গাদাকরা বাক্স দড়িদড়া, ওরই একপাশে একটু শোবার জায়গা করেছে তেরপলগুলোর ওপর।

বেন্দা পদা সানাইদার ওরা মুখিয়ে ছিল। বলরামের গা-গতর টান টান হয়ে আসে। জানে এইবার একটু ছিলিমের দরকার। ওটা তার বহুকালের অভ্যাস। অতীতের প্রাচুর্যের দিনগুলোর সাক্ষী হিসাবে টিকে আছে মাত্র ওইটুকুই। মদের পয়সা আর জোটে না, গাঁজাই টানে।

রাত্রির প্রথম দিক। মেলা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ মেলা নয়—যেন শহরই। যেমন রাস্তা তেমনি ঝকঝকে দোকান-পসার। মাইকে শোনা যায় সেই ফুল আর কে কাকে ভালোবাসে তারই গান। বিশাল তাঁবুটায় ছায়াবাজি চলেছে।

ওদিকে সার্কসের তাঁবু, গোল বিরাট উঁচু তাঁবুটার এদিকে দেখেছে সিংহ আর বাঘের খাঁচা। গর্জন করছে তারা রাতের অন্ধকারে।

কেমন সুন্দর শাড়িপরা কত শহুবে মেয়েছেলেও এসেছে মেলা দেখতে। ঠিক আগেকার সেই গরুর গাড়ির ভিড় জমানো আর দল বেঁধে মুড়ির পুঁটলি ঘাড়ে ছেলে-মেয়ে-বুড়ি সমেত ভিড় জমানো মেলা এ নয়।

এরই মাঝে তাদের এই সঙের বাজি না আনাই ছিল ভালো। পাশের ছোট্ট তাঁবুতে লোকটা প্রাণপণে চিৎকার করছে: দো আনা—দো আনা!

কিন্তু দেখেছে বেন্দা লোক আর আসে না এদিকে। ওপাশ থেকে উঁকি মেরে পার হয়ে যায় লোকজন। হয়তো ভুলে কেউ এক-আধজন গরীব লোক ঢোকে ছেলেপুলে সমেত, মেলায় বাজি দেখাবে বলেছে—সেই কথারই যেন প্রতিশ্রুতি রেখে গেল মাত্র ছেলেপুলেদের কাছে।

অন্য লোকজন বাবুব দল এদিকে উঁকি মারে না, তাদের জন্য অন্যদিকে অনেক আকর্ষণ আছে। দোকান-পসার রয়েছে। পুরন্দর ওই বাজিওয়ালার অবস্থা দেখে অনুমান করে তাদের অবস্থা কি হবে।

সারাদিন একরকম খাওয়া নেই বললেই হয় লোকগুলোর। সেই দুপুরে চাট্টি ভাত খেয়েছিল, পথের ধকলে কোন্‌দিকে তা চলে গেছে। আবার খিদেটা চাগিয়ে উঠেছে। কুঁইকুঁই করছে নাড়িগুলো। পদা বেন্দা গাড়োয়ান সকলেই তা বুঝছে।

পদা বলে ওঠে—ই শালা এখানে থেকে কি হবে বেন্দা?

বেন্দা জবাব দেয় না, মনে মনে কি ভাবছে।

পুরন্দরকে ঢুকতে দেখে ওরা চাইল। পুরন্দরের আজ মেলার সদরে ঠাঁই নেই। মনটা ভারী হয়ে গেছে। অনুমান করেছে এখানেও তার ভবিষ্যৎ কি হবে। আস্তানায় পা দিতেই বেন্দা ফোঁস করে ওঠে:

—খোরাকি দিতে হবে না? হাওয়া খেয়ে থাকবো অধিকারী মাশায়?

পদা পোঁ ধরে—ভ্যালা বিচের যা হোক তুমার!

পুরন্দর ওদের দিকে চাইল। এই আলো-রোশনি আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে এই নগ্ন দারিদ্র্য বেমানান। তার না এলেই ছিল ভালো। এখানে এমনি নির্দয় ব্যবহার পাবে আশা করেনি।

পকেটে শেষ সম্বল কয়েকটা টাকা ছিল, তাও গাড়িভাড়া দিতেই প্রায় চলে গেছে। তুজনকে তুটো টাকা তুলে দেয় তার থেকে। পড়ে রইল সামান্য মাত্র।

পুরন্দর অনেক কষ্টেই বলে ওঠে :

—এক পালা গান করে তারপর দেখবো কি হয়। ভাবছি দল তুলেই দোব।

কানিফুড়ো পাশে বসে ছিল। ছোঁড়াটা সবে খেলা শিখছে। সেইই একমাত্র একটু তুঃখ পায়। বলে ওঠে :

—সি কি গো? দল তুলে দেবা অধিকারী? এস্টাটপত্র তাহলে কি করবা?

চটেই ছিল বেন্দা, বলে—তোকে দানপত্তর করে যাবে রে শালো!

পদা বলে ওঠে—তা দল তুলবে ঠিকই যদি করেছ, পরে আর কেনে, আগেই ছেড়ে দাও—পথ দেখে লিই আমরা।

একটা করে মাত্র টাকা পেয়েছে, ওতে কি হবে জানে না তারা। চটেই ছিল। তাই ছোটমুখে কড়া কথা শোনাতে ছাড়ে না তারা।

পুরন্দর ওদের দিকে চাইল। ওদের সামনে এখনও অনেক দিন আছে। রঙীন আশাভরা দিন। কিন্তু তার?

আর কিছু করবার নেই। সারা শরীরের মনের উৎসাহ তেজ সব একেবারে ফুরিয়ে গেছে। দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই।

চুপ করে ছেঁড়া তেরপলের উপর বসে হাঁপাচ্ছে। মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে উঠেছে। শীতে কাঁপছে সে।

ক'দিন প্রায় অনাহার আর জ্বরে ভুগছে, জোরে কথা বলতে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

যে মেলা তাকে নতুন জন্ম দিয়েছিল, স্বীকৃতি খ্যাতি গৌরব এনে

দিয়েছিল, সেই মেলাতেই আজ তাকে নিষ্ঠুর নিয়তি হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে চরম প্রতিশোধ নিতে। পুরন্দর তাই যেন ভয় পেয়েছে।

অবিনাশ অধিকারীর কথা মনে পড়ে।

পাতা ঝরে যায় গাছ থেকে, আবার আসে নতুন পাতা। যারা ঝরে গেল তাদের কথা কেউ মনে রাখে না—গাছও না। একদিন রোদে নধর সবুজ হয়ে ওঠে, বৃষ্টির ধারাস্নানে যৌবনদৃপ্ত সাজ সাজে, আবার সবকিছু একদিন নিঃস্ব শীতের শাসনে নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে যায়।

ঝরে যায়। গাছও তার হিসাব রাখে না।

ধরাগলায় পুরন্দর বলে ওঠে—যা ভাল বুঝিস করগে তোরা। তোদের ওপর কোন জোর আর আমার নাই।

গজগজ করে ওরা বের হয়ে গেল অন্ধকারে।

একাই বসে আছে পুরন্দর। বসতে পারে না। কোনমতে এলিয়ে পড়ে। বলরাম বের হয়ে গেছে। কানিকুড়ো ঝিম মেরে বসে আছে। কি ভাবছে সে। মেলার এত আলো সুর তার কাছে কেমন বিশ্রী ঠেকে।

পুরন্দর ফতুয়ার পকেট হাতড়ে একটা দুয়ানি বের করে।

পয়সা ক'টা আঙুলের ডগায় এসে ঠেকেছে। মাত্র ওই তার শেষ সম্বল। এতদিনের পরিশ্রম আর সাধনার শেষ দক্ষিণা।

দুয়ানিটা তুলে দেয় কানিকুড়োর হাতে। বলে ওঠে :

—যা, মুড়িটুড়ি খেয়ে আয়। মেলাতেও ঘুরে আয়। ঠায় বসে থেকে কি করবি !

ছেলেটা দেখেছে অধিকারীর অবস্থা। আমতা আমতা করে : তুমি কিছু খাবা না অধিকারী মাশায় ?

—না। পুরন্দরের খাবার উপায় আর নেই।

বের হয়ে যাচ্ছে কানিকুড়ো। পুরন্দরই বলে ওঠে—চিনে আবার আসতে পারবি তো, সাঙ্গীন মেলা। হারিয়ে যাস নে কোথাও।

—না গো। সি ভাবনা নাই।

কানিকুড়োও বের হয়ে গেল।

একাই পড়ে রয়েছে পুরন্দর ওই ছেঁড়া চট আর সামিয়ানার স্তূপের মাঝে।

চারিপাশে ছড়ানো পুতুলের কয়েকটা বাক্স, কোন হারানো সাম্রাজ্যের শেষ ধ্বংসাবশেষ।

স্তব্ধতা আর হালকা আলো-আঁধারে ভরে উঠেছে ছেঁড়া ধুলোভর্তি চটের ঘেরটা। আলোও জ্বালেনি।

কম্বল চাপা দিয়ে পড়ে আছে পুরন্দর।

কাশি আসে। বুক-পিঠ টেনে ধরেছে। গলার কাছে কেমন সাঁই সাঁই শব্দ ওঠে। নিজের কানেই শব্দটা কেমন বিচিত্র ঠেকে। হাঁপাচ্ছে দম নিতে।

ভয় হয়।

একা আঁধারে পড়ে আছে। মনে হয় এই আঁধারেই যেন হারিয়ে যাবে, একেবারে হারিয়ে যাবে সে। সবাই যেমন হারিয়ে গেছে তার জীবনে তেমনি এবার তারই হারাবার পালা।

একটা সুর উঠেছে। করুণ সুরের রেশ।

টকিবাজি দেখেছেও পুরন্দর বহরমপুরে।

সেই বায়স্কোপ যে মেলায় পথে মাঠে এসে হানা দেবে তা ভাবেনি। তবু সুরটা ভালো লাগে।

কেমন আঁধার—তারার আলো—মেলার ওই কোলাহল—সব অতীত দিনের স্মৃতি ওই সুরে মিশে একাকার হয়ে গেছে। পুরন্দরের জীর্ণ মনে তাই ওই সুরটা কান্নার মত ভেসে ওঠে।

ললিতার অনেকদিনের অভ্যাস যাই যাই করে এখনও যায়নি। পথে পথে সেই যাযাবরবৃত্তি—তারই মাঝে ওই গানের দলে কোন পথ না পেয়েই টিঁকে ছিল।

অনেক ঝড় বাধা উঠেছিল ললিতার মনে।

তাই সেদিন অবিনাশের দেওয়া পরিচয় স্নেহটুকুকে কেন্দ্র করেই নতুন ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ঘরও থাকেনি।

ধ্বসে গিয়েছিল গঙ্গার অতলে। অবিনাশও হারিয়ে গিয়েছিল। আবার সেই পথেই ফিরে এসেছিল ললিতা। তবু মন মানেনি এখানে থাকতে।

পথে প্রান্তরে মেলায় ঘুরেছে কিসের সন্ধানে। দেহের বুভুক্ষার চেয়ে মনের সেই চাওয়ার তীব্রতা ছিল বেশী। সারা মন দিয়ে কামনা করেছিল একজনকে ভালবাসবে, ঘর বাঁধবে।

তাই পুরন্দরের কথাগুলো তার মনে একটি আশ্রয়ের, একটি নীড়ের স্বপ্ন এনেছিল। এগিয়ে এসেছিল বুক-ভরা আশা নিয়ে ললিতা সেই রাত্রে বক্রেশ্বরের মেলায়।

কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্য সেদিন ওর কাঙালপনায় হেসেছিল। পুরন্দর তারপর হারিয়ে যায়। পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

ললিতা সেদিন কেঁদেছিল, এই তার ভাগ্য। যখনই কিছু পেতে চেয়েছে—সেই পাওয়ার সব স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিয়েছে নিষ্ঠুর বিধাতা কোন নির্মম অভিশাপে।

এই জীবনের মাঝেই তাকে পড়ে থাকতে হবে। একেই সহনীয় করে তুলতে হবে, এই তার বিধান।

নিঃশেষ হয়ে যায় ললিতার মনের সেই স্বপ্ন—চাওয়া-পাওয়ার আশা। এবার এই জীবনকেই মেনে নিয়েছিল মাথা পেতে, সহনীয় করে তুলেছিল।

নিজের সত্তাকে মনকে পঙ্গু অসাড় করে শুধু বাঁচতে চেয়েছে। যে ক'দিন বাঁচা যায় আনন্দটুকু উজাড় করে নিতে।

নতুন করে অতীতের সব পরিচয় স্মৃতিকেও নিঃশেষ করতে চেয়েছে ললিতা। গানবাজনাও শেখে শহরের বাসায়।

মাসী বুড়ি খুশী হয় মনে মনে। বলে ঃ

—যে পুজোর যে মন্তর। ঘরবসত আমাদের মানা ললিতা। ও

মানুষের পুণ্যঠাঁই—লক্ষ্মীর আশ্রয়। পাপ ঢুকলে ঠাঁই হয় না। বুইলি? তাই ওখানে আমাদের ঠাঁই নাই।

—থামো তুমি!

ললিতা তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

ওসব কথা—কোন চিন্তাই আর মনে আনতে চায় না। দুঃখই পায় তাতে।

অনেক ভেবেচিন্তে তার পথও ঠিক করেছে ললিতা।

ওই শীতে গরমে মেলায় মেলায় ভিখিরীর মত ফিরবে না। এক জায়গাতেই আস্তানা পাতবে। শান্তিতে থাকতে চায়।

বলে—মেলায় মেলায় আর যাব না মাসী। শরীর বয় না। ওই শীত ঝলাস আর অনিয়মে কষ্ট হয়।

—বেশ তো।

মাসী একটু ভাবনায় পড়ে। চলবে কি করে। তাছাড়া মেয়ের উড়ু উড়ু মন যে থিতোতে চায়, থিতু হতে চায়—এইটে তার কাছেও ভাবনার কথা।

—শহরেই থাকব। না-হয় অন্য কোথাও। ও-সব আর ভালো লাগে না।

ললিতার সারা মনে যেন গ্লানি জমেছে—ক্লান্তি এসেছে।

শহরেই রয়ে গেল ললিতা।

ওখানেই ফুলচাঁদের সঙ্গে পরিচয়। শহরের কোন পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ীর সন্তান। দু'হাতে পয়সা রোজগার করে।

আসে, হৈ চৈ করে—আবার উধাও হয়ে যায়।

সে আজ ক' বছর আগেকার কথা।

সেই ফুলচাঁদ আজ মস্ত বড় ব্যবসায়ী। শহর ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে রাঢ়ের এই ধানফলা অঞ্চলে এসে কিসের সন্ধান পায় ফুলচাঁদ। ব্যবসায়ী দৃষ্টিতে এখানকার ভবিষ্যৎ সে দেখতে পায়। তাই এসে ক্রমশঃ গেড়ে বসেছে এইখানে।

ফুলচাঁদ বাড়ি-ঘর তৈরি করেছে। বাগানও গড়ে তুলেছে একপাশে। ধান-চালানী কারবারের পত্তন করে প্রথম। তারপর গড়ে তোলে ধানকল।

চারিদিকে চোখজুড়নো সবুজ ধানক্ষেত, এদিক থেকে ওদিক— যত দূর চোখ যায়। মাঝখান দিয়ে ছোট রেললাইনটুকু মাত্র চলে গেছে যোগসূত্র হিসেবে।

ওই ফাঁকা জনমানবহীন মাঠে নতুন পাকা রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে ধানকল। অফুরন্ত ধান সরষে কলাই জন্মে। সবই তার মোকামে আসে। দেখতে দেখতে কয়েক বৎসরে ফেঁপে উঠেছে। জায়গাটার আশেপাশে গড়ে উঠেছে গঞ্জ, হাটবাজার, বসতি।

বানে ভাসা খড়কুটোর মত ফুলচাঁদের আশ্রয়ে এসে জোটে ললিতা। খুশীই হয় ফুলচাঁদবাবু। ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনটাও অনেকটা শৌখিন হয়ে উঠেছে। ফাঁকা মাঠে এই জনবিরল ঠাঁইয়ে ললিতা তাই একটা আকর্ষণ হয়ে উঠেছে তার কাছে।

বাড়ি-ঘর, আশ্রয় করে দিয়েছে তাকে।

ললিতা জীবনের শেষ প্রান্তে একটু আশ্রয় পেয়েছে—পেয়েছে একটু নির্ভর। তাই রয়ে গেছে এইখানেই।

তবু মাঝে মাঝে হারানো দিনের সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। কত হেমন্তের সোনাধানভরা দিনে মাটির সড়ক ধরে এসেছিল তারা—শীতের রুক্ষ বাতাসে সব পাতাঝরা দিনে তারা নতুন কোন মেলার দিকে গেছে।

পুরন্দরকে আজ মনে পড়ে মাঝে মাঝে।

কেমন শান্ত স্থির একটা ছবি। বিবর্ণ হয়ে গেছে তবু এখনও সবুজের শেষ স্পর্শ হারায়নি, মুছে যায়নি মন থেকে।

মেলার ওই আলো গানের সুর জনতা দেখলে এখনও মনকেমন করে ললিতার। কত আপনজন ওই আঁধারে আলোয় আর ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

ফুলচাঁদের কথাটা শুনে একটু অবাক হয় ললিতা।

মেলা থেকে ফিরে এসেছে ওর বাড়িতেই। ক'দিন তার অবসর নেই। আবার এখুনি বের হবে। নতুন ফিল্ম হচ্ছে, তাই দেখতে যাবে। বলে চলেছে আজকের ঘটনাটা ফুলচাঁদ।

আধবুড়ো একটা লোক এসেছে। এককালে এ দিগরের বিখ্যাত পুতুলনাচিয়ে।

—পুতুলনাচ দেখেছ ললিতা ?

ললিতা ওর দিকে চাইল। কেমন সেই দিনগুলো ভিড় করে আসে মনে। কত স্মৃতির ভিড় জমে।

ললিতা আনমনে কি ভাবছে।

সবুজ বাঁশবনঢাকা এতটুকু ঠাঁই, পাখীর সুর ওঠে। সেই স্মৃতি আজও ভোলেনি ললিতা।

মনে পড়ে এখনও পুরন্দরের কথা, তার পুতুল—কত পালাগান। নিজের হাতে রং করে দিয়েছে পুতুলগুলোকে। কাপড়-ঘাগরা পরিয়েছে।

পুরন্দরের নিবিড় স্পর্শ-মাখানো সেই স্মৃতি।

বৈকালের ম্লান আলো নামে বাঁশবনে, কোথায় বাসায় ফেরা পাখী ডাকছে উদাস করুণ সুরে, বাতাসে আতাফুলের তীব্র সৌরভ, রোদপাকা হলুদ সোনালী পাতা ঝরে সেই হু হু বাতাসে।

কত আনন্দভরা দিন। সেগুলোকে আজও ভোলেনি ললিতা।

জীবনের প্রথম পাওয়ার প্রসাদে পূর্ণ—চিত্র-বিচিত্র।

ফুলচাঁদের টুকরো কথাগুলো কানে আসে ললিতার।

—লোকটার নাম কি যেন—পুরন্দর।

চমকে উঠে ললিতা ওর দিকে চাইল, যেন নিজের কানে ও-কথাটা শোনেনি।

পুরন্দর দীর্ঘ দিন পরে আজ আবার মেলায় ফিরে এসেছে। বেঁচে আছে।

আবার সগৌরবে নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় অতীতের সেই শিল্পী।

ললিতা কেমন স্বপ্ন দেখছে। দূর আকাশে একটা চিল উড়ছে।

ফুলচাঁদ বলে চলেছে হাসতে হাসতে :

—আরে, সে বলে কিনা সিনেমার ওই জায়গার পাশে তাকে জায়গা দিতে হবে। নতুন খেলা—তার নাম এ মুলুকে সবাই জানে। আমি তো শোনেনি—তুসরা অনেকেই শোনেনি। কোইভি শোনেনি। আরে, তুমি তো এ মুলুকেরই লোক—তুমি কভি শুনেছ ?

চুপ করে থাকে ললিতা। জবাব দেয় না ওর কথায়। কি ভাবছে। পুরন্দর !

তার মনের একটা মধুর স্মৃতির আকাশ, অধরা কোন সম্পদ—তার পরিচয় সে দিতে চায় না।

তা তার একান্ত নিজেরই থাক।

গোপন থাক মনের অতলে, যেমন থাকে রাতের তারা দিনের আলোর অতলে।

ফুলচাঁদ বলে ওঠে—নতুন সিনেমা এসেছে। ভাল খেলা—যাবে নাকি ?

ললিতার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেছে।

ওই সুর আর আলোয় কেমন সব হারিয়ে গেছে তার। সবুজ স্বপ্ন—অতীতের সেই দিনগুলোও।

আজকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়—পয়সা, ওই ফুলচাঁদকেও কেমন অন্য-রকম মনে হয়। সবাই যেন কোন পরম পাওয়া থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। যা চেয়েছিল তা সে পায়নি।

যা পেয়েছে তা তার ভুল করেই চাওয়া ; মনের অতলে সেই বুভুক্ষা-স্বপ্ন তার অতৃপ্ত অপূর্ণই রয়ে গেছে।

রাত নামে।

ফুলচাঁদ একাই বের হয়ে গেছে। শূন্য বাড়িতে বসে আছে ললিতা একা। মনে ভাবনার ঝড় বয়ে চলেছে। পুরন্দর !

কেমন মন উতলা হয়। ওই আলোভরা প্রাণবন্ত মেলার দিকে এগিয়ে যেতে মন টানে কি এক দুর্বার আকর্ষণে।

ও-পথে বহুবার গেছে, ওই বাগান মাঠ তার খুব চেনা। কোথায় কোন্ দোকানের সারি তা ও জানে।

বের হয়ে এল ললিতা পথে—ওই আলো-আঁধারি ঢাকা রাত্রের পথে। মনে আজ কি একটা দুর্বার স্বপ্ন।

বহু অতীতের সেই ললিতা আজ বয়সের মানা, তার পরিবর্তনের বেড়াও পার হয়ে নিজের হারানো দিনগুলো, তার যৌবনের প্রথম দিনগুলো খুঁজতে বের হয়েছে।

একা চুপ করে আছে পুরন্দর ছেঁড়া তাঁবুর ভিতর।

আঁধার নেমেছে। হঠাৎ কানিকুড়োকে ফিরতে দেখে ওর দিকে চাইল। ওর হাতে একটা ঠোঙ্গায় কি সব খাবার। এগিয়ে আসে ছেলেটা ওর কাছে।

হাঁপাচ্ছে কানিকুড়ো। অনেকটা পথ যেন দৌড়ে এসেছে।

একটু দম নিয়ে বলে ওঠে ঃ

—সারাদিন কিছু খাওনি অধিকারী মাশায়! মুখে দাওদি'ন। ভালো সন্দেশ গো!

—কোথায় পেলি ?

পুরন্দর জানে ওর কাছে কিছু পয়সাকড়ি নেই।

থাকবার কথাও নয়। হয়তো জমানো কিছু ছিল আগেকার দরুন, তার থেকেই এনেছে তার জন্য।

কানিকুড়ো এরই মধ্যে কলাইকরা তোবড়ানো টিনের গেলাসে জল এনে হাজির হয়েছে।

—লাও, কপ্ কপ্ করে মুখে পুরে লাও। গায়ে জোর পাবা। কাল আবার খেলা দেখাতে হবে তো।

পুরন্দর মিষ্টির ঠোঙ্গাটা হাতে নেয়। জিজ্ঞাসা করে ঃ

—হ্যাঁরে, তুই খেয়েছিস ?

পুরন্দর জীবনে অনেকের অনেক ভালবাসা কুড়িয়েছে, কিন্তু ওই কানিকুড়োর এই দয়া যেন সব চেয়ে বড় বলে ঠেকে।

কানিকুড়ো বলে :

—হিঃ ! লাও, গরম গরম জিলাপি আছে, সর্দিতে ভালো ওষুধ খেয়ে লাও দিকিন কপ্ করে।

পুরন্দরের খিদেও পেয়েছে। এতক্ষণ কিছু খাবার ছিল না বলেই খিদেটাও পায়নি। পয়সাকড়িও আর নেই যে খাবে কিছু। কাল পর্যন্ত উপোষই দিতে হত তাকে।

হাতে খাবারগুলো পেয়ে চাপাপড়া ভুলে যাওয়া খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে দ্বিগুণ জ্বালায়।

চিবোতে থাকে জিলাপিগুলো। কেমন উষ্ণ মিষ্ট একটা স্বাদ। পুরন্দর অনেকদিন পর যেন এই প্রথম খেতে পেয়েছে! হ্যাঁ, প্রায় দু'দিন কিছুই তেমন খায়নি।

খিদেটা ক্রমশঃ চাড়া দিয়ে ওঠে, মিষ্টি স্বাদটা শরীরে একটু মোলায়েম উষ্ণতা আনে।

ভালো লাগে।

এদিক-ওদিকে চাইছে কানিকুড়ো! সাবধানী সন্ধানী দৃষ্টিতে। হঠাৎ কাদের আসতে দেখেই ঘাবড়ে যায়।

খুঁজে খুঁজে খাবারের দোকানের লোকগুলো ঠিক এসেছে। মেলায় এমন চুরি-জোচ্চুরি প্রায়ই ঘটে। খেয়েদেয়ে মিষ্টিপত্র নিয়ে দাম দেবার অছিলায় এদিক-ওদিক করে অন্ধকারে কেটে পড়ে অনেকে, তাই দোকানদাররা চালাক হয়ে গেছে।

খদ্দেরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে—পালাবার পথ থাকে না। তবু অনেকে খাবার নিয়ে পালায়।

কানিকুড়ো তাই করেছে।

না করে তার পথ ছিল না। দেখেছে পয়সাকড়ি নেই। যা ছিল

বেন্দা পদাকে দিয়ে-থুয়ে নিজেই উপোস দিচ্ছে অধিকারী ওই জ্বরগায়ে।

দেখেছে দু'দিন খায়নি লোকটা।

নিজের জন্য নয়—অধিকারী মশায়ের জন্য এ কাজ করেছে কানিকুড়ো।

খাবারপত্র নিয়ে সে সরে পড়েছিল দাম না দিয়েই।

কিন্তু পিছনে যে ওরা ছিনে জোঁকের মত লেগে এতদূর অবধি এসে তাঁবুতে ঢুকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলবে, তা ভাবেনি। ওরা মারমুখী হয়ে এসে চড়াও হয়।

—এই যে শালা চোর এইখানে।

একেবারে এসে কানিকুড়োর চুলেব মুঠিই ধরে তারা।

কে নির্দয়ভাবে ওকে এক চড় কসেছে, ওই চড়েব ধাক্কায় ছিটকে পড়ে কানিকুড়ো চটের গাদায়।

আবার চুলের মুঠি ধরে তারা তাকে টেনে তুলেছে।

অবাক হয়ে যায় পুরন্দর। বাধা দেবার চেষ্টা করে।

লোকটা গর্জে ওঠে :

—বুড়ো ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে আর ছেলেটাকে পাঠিয়েছে চুরি করতে। পেট না চলে ভিক্ষে করলেই তো পাবো ও হে স্যাঙ্গাৎ! গলা দিয়ে নামছে ইসব?

পুরন্দরের হাত থেকে ঠোঙ্গাটা পড়ে যায় মাটিতে, ছিটিয়ে পড়ে জিলাপি, কয়েকটা সন্দেশ। গলায় আটকে আসে পদার্থগুলো। অসহায় রাগ আর দুঃখে কাঁপছে সারা শরীর। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, কেমন চোখ দুটো জলে ভবে ওঠে পুবন্দবের।

ওরা নির্দয়ভাবে কানিকুড়োকে মারছে; চড় কিল লাথি পর্যন্ত। বাধা দেবার সামর্থ্যটুকুও নেই পুরন্দবেব।

পুরন্দর বলে ওঠে—মেরো না ওকে। ছোট ছেলে।

—খাবারের দাম দাও, এক টাকা।

লোকটা দাম না পেলে যেন আরও মারবে। মেরে দাম উসুল করে

নিয়ে যাবে। পুরন্দর শূন্যদৃষ্টিতে চাইল। এক টাকা! তার কাছে আজ ওটা স্বপ্ন।

সারা জীবনের কোন সঞ্চয়ই নেই যার দাম এক টাকা হতে পারে। নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত একটি মানুষ।

লোকটা বলে—খোল শালার চট। চটই নিয়ে যাবো।

পুরন্দর কি বলবার চেষ্টা করে, ঠিক বোঝা গেল না। অপমানে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায় সে। লোকটা জিজ্ঞেস করে :

—কিসের দল?

জবাব দেয় কানিকুড়ো—পুতুলনাচের দল।

লোকটা মুখবিকৃত করে—পুতুলনাচের দল! সে ছিল পুরন্দর অধিকারীর। সে ফৌত হয়ে গেছে তো ব্যস্। এ চাকলায় আবার পুতুলনাচ জানে কোন্ শালা! যত্তো সব চোরের দল! তোল, চটটাই তোল। চট চটই সই, তাই লোব।

একটা ভালো চট তুলে নিয়েই চলে যায় তারা। তবু লাভই হল দোকানীর। ঝাঁপের কাজ চলে যাবে ওতে।

তবু যাবার সময় শাসিয়ে যায় কানিকুড়োকে।

—ফের যদি ওদিকে দেখি, এসে আগুন জ্বেলে দিয়ে যাবো তাঁবুতে। পুতুলনাচের দল! চোরের দল বলবি এইবার থেকে। বুইলি? ঘাটের মড়া—গিলছিল কোঁৎ কোঁৎ করে, দিতাম এইসান গদাগদ্ কিল, যাঃ!

নেহাত যেন দয়া করেই তাদের জ্যান্ত রেখে দিয়ে গেল—এমনি ভাবখানা করে দোকানদারের চেলা-চামুণ্ডারা বের হয়ে গেল।

আবার অন্ধকার নামে ছেঁড়া তাঁবুতে।

ওপাশে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা, তার কান্নার শব্দ ওঠে আঁধার পরিবেশে। ওরা দুজনেই যেন মানুষের রাজ্য থেকে নির্বাসিত জীব।

চুপ করে বসে আছে পুরন্দর।

এত গালমন্দের মাঝেও একটা কথা কানে গেছে তার। পুরন্দরের নাম। অতীতের সেই গৌরবদৃপ্ত যুগের পুরন্দর।

সেই উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু আজও অনেকের মনে বেঁচে আছে।

কি ভাবছে পুরন্দর। বলে ওঠে :

—হ্যাঁরে, খুব লেগেছে ?

কানিকুড়ো ওর দিকে চাইল। মাথা নাড়ে :

—না। উতে আমার কি হবে ? আর খাবা নাই অধিকারী মাশায় ?

পুরন্দরের আহারে—ওই খাবারগুলো খেতে আর রুচি নাই।

কানিকুড়ো ধুলো-ময়লালাগা জিলাপির টুকরোগুলো হাতড়ে তুলছে আর মুখে পুরছে। চিবোতে চিবোতে বলে চলেছে :

—টকিঁবাজির ওখানে কি ভিড়—বান্‌তানাস্‌ রে ! আর সোন্দর গাঁন। ছবিতে কথা বলছে, নাচছে। আর বেন্দা খুড়ো কি বলছিল জানো মাশায় ?

—কি ? পুরন্দরের ঝিমুনি আসছে।

এদিক-ওদিকে মালপত্র পুতুলগুলো ছড়ানো।

কানিকুড়ো বলে চলেছে :

—উরা আর এ দলে আসবে না বলে দিয়েছে।

—তাই নাকি ? চমকে ওঠে পুরন্দর। একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে সে। পুরন্দরের তন্দ্রা ছুটে গেছে।

কানিকুড়ো বলে :

—হিঃ গো। স্বচক্ষে দেখলাম ফুলবাগানে ঝুমরি লাচের দলে ঢোল বাজাচ্ছে বেন্দা খুড়ো, আর পদা আছে সানাই লিয়ে। মাজায় লোতুন গামছা বেঁধে মদ মেরে বেন্দার কি লাচন আব ঢোল বাজানো—সি যদি দেখতা। উই তো বললে—যা বলগে মাশায়কে, আমরা ইরোই থাকবো। ফুটো দলে আর যাবো নাই।

পুরন্দর যেন ওর কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না।

দলের সবাই একে একে পালিয়ে গেল—খসে গেল।

কানিকুড়োর চোখের সামনে এই ঘুপসি তাঁবু আর নির্জন হতাশার

আভাস কেমন বিশ্রী লাগে। আলো—সুর—ওই ছায়াছবি তাকে ডাক দেয়। উসখুস করে সে।

পুরন্দর চুপ করে বসে আছে।

কানিকুড়ো এতক্ষণ ধরে জিলাপির টুকরোগুলো কুড়িয়ে মুখে পুরছিল। সেগুলো ফুরিয়ে যেতে এদিক-ওদিক হাতড়ে ব্যর্থ হয়ে উসখুস করে। এখানে মন বসছে না তার। বলে ওঠে :

—একটু টকিবাজির উদিকে ঘুরে আসবো মাশায় ?

—যা।

পুরন্দর ঝিমুচ্ছে। কেমন অবশ হয়ে আসে দেহ-মন। একলাই ভালো লাগে এমনি করে নিঃশেষে হারিয়ে যেতে। চটখানা খুলে নিয়ে গেছে মিষ্টির দোকানদাররা। বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে মাথার উপর।

হাওয়া ঢুকছে। শীতরাতের কনকনে হাওয়া।

কোথায় একটা সুর জেগে ওঠে—মিষ্টি সুরটা।

আনমনা করে তোলে।

কোন্ সুদূর থেকে ওই সুরটা উঠছে।

আজাহার গাইত কর্ণার্জুন পালার গান।

—ললাটপটের কালের লিখা।
চিরঅদেখা করে
চলেছি গো একা॥

আজ সেই গান আরও করুণ সুরে ফুটে উঠেছে রাতের নিঝুম অন্ধকারে। মেলায় বায়স্কোপের ওখানে গানটা উঠছে। রেকর্ড বাজাচ্ছে বোধহয়।

হবেও বা।

নিয়তিই।

সেদিন যে জয়মাল্য কুড়িয়েছিল এই মেলা থেকে, আজ সেইখানে একটা ধ্বংসস্তূপের মত পড়ে আছে অবজ্ঞার অন্ধকারে পুরন্দর সূত্রধর।

কেমন বুকটা টেনে ধরে—নিশ্বাস নিতে পারে না।

দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়। ঘড়ঘড় শব্দটা ক্রমশঃ যেন বাড়ছে। কনকনে শীতে হাতটা অবশ হয়ে আসছে। চাদর টেনে গায়ে চাপাবার ক্ষমতাটুকুও নেই।

ঠকঠক করে কাঁপছে। কেমন তেষ্টা লাগে তার'

ওই লোকগুলো আসার সময় জল খেতেও ভুলে গেছে। গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে পুরন্দর। স্বর বের হয় না। ডাকতে থাকে ঃ

—কুড়ো! কুড়ো রে!

কানিকুড়ো নেই। সে মেলার আনন্দস্রোতে কোথায় ভেসে গেছে। এই দুঃখ, হতাশা আর নিশ্চিত কোন সর্বনাশের আঁধার থেকে সরে থাকতে চায় ছেলেটাও।

হাতড়াচ্ছে পুরন্দর।

অন্ধকারে পুতুলটায় হাত ঠেকে। অনেক পুতুল—পুতুলের স্তূপ। নির্জীব প্রাণহীন পুতুলের রাজ্যে একা সে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু নিয়ে বসে আছে।

জলের জন্য হাতড়াচ্ছে।

অন্ধকারে হাত ঠেকে ছড়ানো পুতুলগুলোর ওপর।

কর্ণ-সিন্ধুমুনি-রাম-লক্ষণ-অর্জুন-দুর্যোধন-সিরাজদ্দৌলা-লুৎফা—আরও কত। কত দিনের সঙ্গী ওরা।

জীবনের কত স্মৃতি, কত উজ্জ্বল আশা-আনন্দ আর জয়ের গৌরবময় রঙীন দিনের সঙ্গী ওরা।

উঠে বসেছে পুরন্দর।

হাতের কাছের পুতুলটার দিকে চেয়ে থাকে। আবছা আলোয় ওরা—ওই পুতুলের দল যেন প্রাণবন্ত সজীব হবে উঠেছে।

কর্ণ-দুর্যোধন-সিন্ধুমুনি-সিরাজ-লুৎফা—ওরা সবাই।

যুগযুগান্তর কালকালান্তর আজ তার সামনে উজ্জ্বল আভায় ফুটে ওঠে।

দুঃখ অভিশাপ ব্যর্থতা আর বঞ্চনা এইটাই তিন যুগে সত্য—পরম এবং চরম সত্য।

বাজনার সুর ওঠে।

ন্যাড়ার গলা ভেসে আসে—আজাহার গাইছে।

কারবাইডের আলো পড়েছে রঙীন রকমারী কাপড়পরা পুতুলগুলোর উপর। নড়ছে, গান গাইছে তারা।

হাজারো মানুষের ভিড়ে কার উদগ্র আনন্দমুখর দু'চোখ মনে পড়ে। একটু শ্যামল স্পর্শ—নীলনেশা মাখানো এক স্পর্শ মনে দুর্বার উন্মাদনা আনে।

পুরন্দর সেদিনও ভোলেনি, সবে তখন স্কুল ছেড়ে পুতুল নিয়ে পড়েছে।—ললিতা!

জীর্ণ পুরনো বইখানা থেকে একটা সোঁদা গন্ধ ওঠে। কেমন বিচিত্র সব ছবি।

ললিতা ওর গা ঘেঁষে বসে অবাক হয়ে দেখছে।

—এইসব পুতুল বানাবা?

—হ্যা।

পুতুল থেকে মানুষের মনের খিদে ও দেখেছে। শুনেছে কত সুর। দেখেছে কত জীবনের দিন—কত সবুজ দিগন্ত।

ব্যর্থতা আর আনন্দ-ভরা কত দিন, কত রাত্রি।

বাসিনাকে মনে পড়ে। নামোপাড়ার বাসিনী ধুঁকছে। ঘেংড়ে ঘেংড়ে কাঁদে আর পথ চলে জীবনের বোঝা অভিশাপ বয়ে।

মা-বাবাকেও ভোলেনি পুরন্দর।

বাঁশবনে হলুদ রোদ, পাখীর ডাক মিশে আছে সেই স্মৃতির সঙ্গে।

সৌরভমদির একটি অনুভূতি।

মনকেমন করে—মাকে মনে পড়ে।

মনে পড়ে ফেলে আসা গ্রাম—ময়ূরাক্ষীর তীরের সবুজ বাগান—সেই দিনগুলোকে—ন্যাড়াকে—ললিতাকে।

তারা কেউ হারায়নি।

সবাই বেঁচে আছে।

ললিতার প্রথম স্পর্শ—তার ছুটো কামনামদির চোখের চাহনি আজ মনে পড়ে।

দেখেছিল এই বৈরাগীতলার মেলাতেই। সেদিনের রহস্যময়ী অধরা ললিতাকে ঠিক চিনতে পারেনি পুরন্দর।

অবিনাশ অধিকারীর সঙ্গে তার আসল সম্পর্কটাও জানেনি।

মন ভেঙে পড়েছিল ওকে হারানোর হতাশায়।

কিন্তু বক্রেশ্বরের মেলার সেই রাত্রির স্মৃতি ভোলেনি। বানে খেয়া বন্ধ—নদীর ওপারে থেকে তবু ডাক দিকে গেছে তাকে ললিতা। আশ্রয়ের আশ্বাস এনেছিল, কিন্তু সেদিন সে গ্রহণ করেনি।

ঘরের সন্ধান—শান্তির স্পর্শ সব সে এনেছিল।

কেন যে গ্রহণ করেনি সেদিন, আজও তা জানে না পুরন্দর।

বহুদিন পর আজও সেই ঘরের, একজনের প্রীতির স্বপ্ন দেখে।

সব পাওয়ার স্বপ্ন—সারাজীবনের ব্যাকুল কামনা দিয়ে একটি শান্তি-ভরা ঘর সে বাঁধতো।

সোনারোদ নেমেছে ময়ূরাক্ষীর ধারে বালু মাটির স্পর্শমাখা কালো পাতা ভরা আমবাগানে। পাখী ডাকে। চালতে গাছের পাতায় ঘন সবুজ ছোঁয়া লাগায় দিনের রোদ।

সে আর ললিতা।

কেমন ঘননীল আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়ায়। আলোয় রঙীন কত মেঘ ভেসে চলেছে।

হীরাকষ রঙের আকাশ, জাফরানী মেঘ—তারই মাঝে হারিয়ে গেছে ললিতা আর সে।

কোন্ আলোর দেশে চলেছে পুরন্দর।

পুতুলের রাজ্যে। রাজা-রাণী—কত পৌরাণিক ঐতিহাসিক কালের দেশ—সব ছাপিয়ে উঠেছে একটি সুর।

ললিতার আলোভরা দু'চোখের কামনামদির চাহনি আর নিবিড় স্পর্শ লাগে তার দেহে।

পুরন্দর সেই অধরা রাজ্যের নীল আলোকস্বপ্নে হারিয়ে যাচ্ছে। দূরে, অনেক দূরে চলেছে সে।

এ জগত থেকে অন্য কোন জগতে।

দূর থেকে মনে হয় সেখানে পাখী ডাকে। সুর জাগে।

ললিতা!...

ফিসফিসিয়ে ওঠে স্বরটা। পুরন্দরের কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে।

কেমন গলার কাছে ওই শব্দটা আটকে যায়, দু'চোখে শূন্য উদাস দৃষ্টি। চটের পর্দা খুলে পড়েছে—দূর তারাকিনী হিম কুয়াশার ঘোমটা-টানা আকাশের পানে কি এক দুর্বার কামনা নিয়ে চেয়ে আছে পুরন্দর।

এ জগতে তার কোন কামনা তৃপ্ত হয়নি। বাতিল হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে সে—তাই অন্য কোন জগতের পানে চেয়ে আছে।

—পুরন্দর! পুরোদা!

কার ব্যাকুল ডাক ওঠে।...পুরন্দরের কোন সাড়া নেই। তবু অন্ধকারে আবছা আলো-আঁধারির মাঝে এগিয়ে আসে ললিতা। আজ সে এসেছে পুরন্দরের কাছে।

পুরন্দরের গৌরব আর সব খ্যাতি এমনি করে হারিয়ে যাবে জানে না। দিন-বদলের সঙ্গে এমনি করে ফুরিয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে পুরন্দর, এটা ঠিক মেনে নিতে পারেনি ললিতা।

কিন্তু অবিনাশ অধিকারীও গিয়েছিল—এমনি করেই ফুরিয়ে গিয়েছিল সে বিস্মৃতির অন্তরালে।

আজ পুরন্দরও গেল। দুটি যুগ ঝরে গেল তার স্মৃতি থেকে।

ললিতা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আজ পুরন্দরকে সে এই অপমান বিস্মৃতির হাত থেকে কিছুটা ফেরাতে পারে। দিন তার বদলেছে।

অতীতের সেই ব্যাকুল মন আজও নিঃশেষে হারায়নি ললিতার। তাই ছুটে আসছে আজ রাতের-আঁধারে ওকে ফেরাতে।

—পুরোদা!

নাড়া দিচ্ছে ওকে ললিতা।

কোন সাড়া নেই। হিমশীতল দেহটা কেমন কাঠের পুতুলের মত গড়িয়ে পড়ল ওই পুতুলের স্তূপে।

চমকে ওঠে ললিতা।

—পুরন্দর!

কোন সাড়া নেই। তখন অনেক দূরে চলে গেছে পুরন্দর।

যে ললিতাকে সে পায়নি সেই অধরার স্বপ্নরাজ্যে কোন্ মেঘলোকে হারিয়ে গেছে পুরন্দর।

সে জানল না—ললিতা আবার ডেকে ডেকে ফিরে গেল আজ। বহুদূর থেকে, খেয়াবন্ধ নদীর ওপার হতে—যাতায়াত যেখানে চলে না সেখান থেকে আজও সে ডাকে।

মৃত্যুর কালো মেঘছায়াঢাকা আকাশকোলে সব হারিয়ে গেল।

পুরন্দর এতদিন পুতুলের রাজ্যে বাস করে আজ নিজেই ওই বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা নিষ্প্রাণ পুতুলের মাঝে হারিয়ে গেল—ইতিহাস হয়ে গেল।

আজকের দিন তার কোন খবরই রাখেনি।

মেলা-কমিটি পরদিন ওই স্তূপ থেকে ওর দেহটা টেনে বের করে। একজন তখনও ছাড়েনি তাকে।

সে ওই কানিকুড়ো।

ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে। কাঁদরের ধারে কাঠকুটো জ্বেলে বেওয়ারিস দেহটাকে ওরা চাঁদা করে সংকার করে।

চোখের জল মুছে তখনও বিড়বিড় করে কাঁদছে কানিকুড়ো। —অধিকারী মাশায় গো! মাশায়—

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একা একটি গুণমুগ্ধ শিশু।

ললিতা দূর থেকে একবার দেখেছিল মাত্র।

সে-ও যেন ওই পুরন্দরকে আজ চেনে না।

চিনে লাভই বা কি! শুধু শুধু দুঃখ করা।

যে ঝরে যাবে, ঝরাটাই তার কাছে সত্য এবং স্বাভাবিক।

তাই পুরন্দরও ঝরে গেছে।

একটি চেতনা—একটি যুগ মরে গেছে আগামী নূতন যুগের রথচক্রে পিষ্ট হয়ে।

কোন্ অতীত কালে মহারথী কর্ণের রথচক্রও ধরণী গ্রাস করে তার ভাগ্যের গতিরুদ্ধ করেছিল।

সন্ধ্যার আলোয় মেলা আবার যৌবনবতী রূপে সেজে ওঠে। অতীতের কোন্ একটি রাত্রে ওই যৌবনবতী পসারিণী একজন যুবককে ক্ষণিকের জন্য নিঃশেষে ভালোবেসেছিল।

আজ তা সে-ও জানে না, তাকে মনে রাখেনি আজকের ওই বৈরাগীতলার মেলা।

সিনেমার তাঁবু থেকে গান শোনা যায় মাইকে। বিজলীবাতির আলোয় অন্ধকার ঘুচে গেছে, আকাশ-বাতাসে জাগে মাইকের শব্দ।

চাঁদ ফুল আর কার ভালোবাসার গান—

সেই সুর উঠছে রাঢ়ের ধুলিধূসর পল্লীপ্রান্তরে রাতের অন্ধকার ছাপিয়ে।

পুরন্দর হারিয়ে গেছে ওই জগৎ থেকে।

ওরা সবাই হারিয়ে যায়, রাতের বাতাসে জেগে থাকে, ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস।